বাংলাদেশ জ্বালানি রূপান্তর নীতি ২০২২

(প্রস্তাবিত)

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

বাংলাদেশ জ্বালানি রূপান্তর নীতি ২০২২

(প্রস্তাবিত)

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

বাংলাদেশ জ্বালানি রূপান্তর নীতি ২০২২ (প্রস্তাবিত)

প্রকাশ কাল
মার্চ ২০২২

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) কর্তৃক
বাড়ি # ৮/৬ (দ্বিতীয় তলা), সেগুনবাগিচা-
ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত
+৮৮০ ২-২২৩৩৮২৮৫৮

মূল্য : ২০ টাকা

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৫৮২২-২-৯

ডিজাইন ও প্রডাকশন
ইনফ্রা-রেড কমিউনিকেশনস লি. (আইআরসি), www.irc.com.bd

উৎসর্গ

জ্বালানি অধিকার আন্দোলনে
যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন

কৃতজ্ঞতা

কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) জ্বালানি অধিকার এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য 'বাংলাদেশ জ্বালানি রূপান্তর নীতি, ২০২২' শীর্ষক একটি প্রস্তাব তৈরি করেছে। এছাড়াও ক্যাব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইন, ২০০৩ এবং বিইআরসি'র ভূমিকার উপর মূল্যায়ন প্রতিবেদনের একটি খসড়াও তৈরি করেছে। এজন্য ক্যাব বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে। এছাড়াও ক্যাব ড্রাফটিং কমিটি, নেটওয়ার্ক বিল্ডিং কমিটি ও স্টেকহোল্ডার কমিটি নামে আরো তিনটি কমিটি গঠন করে।

জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি, ক্যাব-এর আহ্বায়ক স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার নিউমেরিক প্রফেসর বদরুল ইমাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ, ক্যাবের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ও জ্বালানি উপদেষ্টা অধ্যাপক এম শামসুল আলম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মলয় কুমার ভৌমিক, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার সালেক সুফি, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা)-র নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-র গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এবং ক্যাবের অনলাইন পত্রিকা ভোক্তাকণ্ঠ ডট কমের সম্পাদক কাজী আব্দুল হান্নান। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা।

ড্রাফটিং কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। এছাড়াও এই কমিটিতে ছিলেন অধ্যাপক এম শামসুল আলম, জ্বালানি নীতি গবেষক ও লেখক মনজুরুল আহসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব এনার্জি-র সহকারি অধ্যাপক এস এম নাসিফ শামস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারি অধ্যাপক সারওয়াত শামীন, সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট আব্দুল্লাহ আল নোমান, অস্ট্রিয়ার গ্রাজ ইউনিভার্সিটির পিএইচডি গবেষক রাফিয়া জামান এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির সহকারি অধ্যাপক তাসমিয়া বাতেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা ও প্রজ্ঞায় বাংলাদেশ জ্বালানি রূপান্তর নীতি, ২০২২ ও বিইআরসি আইন ও বিইআরসি'র ভূমিকার ওপর মূল্যায়ন প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য তাঁদের প্রতি রইলো আমাদের অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

নেটওয়ার্ক বিল্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন কাজী আব্দুল হান্নান। ক্যাবের উপদেষ্টা (ভোক্তা অভিযোগ) ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম খাদেমুল ইসলাম, ক্যাবের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ মিজানুর রহমান, খুলনার ইনিশিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ (আইআরভি)-এর নির্বাহী পরিচালক খালেদ পাশা জয়, বরিশালের 'পর্যটন'-এর নির্বাহী পরিচালক তৌহিদুর রহমান শাহজাদা এবং ক্যাবের প্রচার সম্পাদক ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির সিনিয়র প্রভাষক মুহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম উক্ত কমিটিতে ছিলেন। তাঁদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

স্টেকহোল্ডার কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান। এছাড়া সৈয়দ মিজানুর রহমান, বরিশালের 'পর্যটন'-এর নির্বাহী পরিচালক তৌহিদুর রহমান শাহজাদা, মুহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম, রাজশাহীর 'পরিবর্তন'-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদ ওবায়েদ রিপন এবং চট্টগ্রামের 'সংশপ্তক'-এর নির্বাহী পরিচালক লিটন চৌধুরী এই কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের সবার প্রতি রইল অসংখ্য ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা।

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন

আহ্বায়ক, ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তি জাতীয় কমিটি
কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

মুখবন্ধ

ভোক্তার জ্বালানি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করছে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যে এবং সঠিক মাপে ও মানে ভোক্তারা যেন জ্বালানি সরবরাহ পান সে লক্ষ্যে ক্যাব নানাবিধ কর্মকান্ড পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ক্যাব 'বাংলাদেশ জ্বালানি রূপান্তর নীতি, ২০২২' প্রস্তাব করেছে।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জ্বালানি সম্পদের মালিক জনগণ। এই সম্পদের ওপর তাদের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে ভোক্তা তথা জনগণ নূন্যতম ব্যয়ে মান সম্মত জ্বালানি সরবরাহ পাবে।

জ্বালানি অধিকার সুরক্ষা ও পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলায় জ্বালানি ব্যবহারে বড় ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ জ্বালানি রূপান্তর ঘটছে। এই পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। পাশাপাশি জ্বালানি খাতে জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতায় জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত হতে হবে। তাই প্রস্তাবিত জ্বালানি রূপান্তর নীতিমালার সাথে 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন' ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) ভূমিকার একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হলো।

এই প্রকাশনাটি ভোক্তার জ্বালানি অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণে সকলকে অধিকতর সচেতন করে তুলবে, আশা করা যায়।

যাঁদের শ্রমে এই নীতিমালা, বিইআরসি আইন ও বিইআরসির ভূমিকা পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবদান জানাই।

গোলাম রহমান

সভাপতি
কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

সূচি

জ্বালানি রূপান্তরের প্রেক্ষাপট ও প্রবণতা ১১

সংজ্ঞা ৩৫

প্রস্তাবনা ৪০

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ৪৪

২. নীতিমালার যৌক্তিকতা ৪৪

৩. কাঠামো ও অনুসৃত রীতি ৪৫

৪. নীতিমালার স্বত্বাধিকার তদারকি এবং রিভিউ ৪৬

৫. রূপকল্প ৪৭

৬. উদ্দেশ্য ৪৭

৭. কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪৮

৮. কর্মপরিকল্পনা ও অর্থায়ন ৬৩

সংযুক্তি ১: বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইন ও বিইআরসি'র ভূমিকা পর্যালোচনা ৬৫

সংযুক্তি ২: এক দশকে ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির চিত্র ৯৫

বাংলাদেশ
জ্বালানি
রূপান্তর
নীতি
২০২২

জ্বালানি রূপান্তরের প্রেক্ষাপট ও প্রবণতা

১৯৯৫ সালে সরকার জ্বালানি নীতি প্রথম গ্রহণ করে। কিন্তু তা বাস্তবায়নে কোন স্বীকৃত কর্মপরিকল্পনা গৃহীত না হওয়ায় এ নীতিমালার সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তন সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভের সুযোগ হয়নি। অতঃপর ২০০৪ সালে জ্বালানি নীতি (সংশোধিত) চূড়ান্ত করা হয়। এ সংশোধিত নীতিমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

১৯৯৫ সালের জ্বালানি নীতিতে জ্বালানি খাত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিম্নরূপ দুর্বলতা চিহ্নিত হয়:

১. আর্থিক সক্ষমতার অভাব, ২. বাণিজ্যিক জ্বালানি সরবরাহ স্বল্পতা, ৩. পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, ৪. উৎকৃষ্ট পন্থায় জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, ৫. যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারিত না হওয়া, ৬. অপরিকল্পিত জৈব-জ্বালানি ব্যবহার ও পরিবেশের বিপর্যয়, ৭. গ্রামীণ জ্বালানি চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে মনোযোগ অপর্যাপ্ত, ৮. প্রযুক্তিগত সক্ষমতা উন্নয়নে পদ্ধতিগত গবেষণামূলক কার্যক্রমে মনোযোগের অভাব এবং ৯. এই খাতের সার্বিক দক্ষতা উন্নয়নে মানসম্মত জনবল তৈরিতেও

মনোযোগের অভাব। এ প্রেক্ষাপটে নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যে জ্বালানি নীতি ১৯৯৫ প্রণীত হয়:

* অঞ্চলভিত্তিক আর্থ-সামাজিক শ্রেণিভেদে জ্বালানি চাহিদা পূরণ,
* উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেন জ্বালানি স্বল্পতার কারণে বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য টেকসই আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে যথাযথ জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা,
* নিজস্ব জ্বালানি সম্পদ উন্নয়ন এবং যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা,
* ইউটিলিটিসমূহের টেকসই পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা,
* পরিবেশবান্ধব টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং
* জ্বালানিখাত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারি ও ব্যক্তি উভয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা।

উক্ত জ্বালানি নীতি বাস্তবায়িত হয়নি। তবে চলমান জ্বালানি রূপান্তর কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার অব্যাহত বৃদ্ধিতে **জিডিপির** ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। কাম্য আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হচ্ছে। কৃষিতে ব্যবহৃত জ্বালানি ভর্তুকি পায়। ফলে খাদ্যের ওপর ভোক্তার স্বত্বাধিকার বহাল রয়েছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা অনেকাংশে সুরক্ষিত। খাদ্যের তুলনায় জ্বালানিতে অধিক পরিমাণে ভর্তুকি থাকা সত্ত্বেও খাদ্যের মত জ্বালানির ওপর ভোক্তার স্বত্বাধিকার অর্জিত হয়নি এবং জ্বালানি নিরাপত্তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। বরং অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে জ্বালানি সরবরাহে লুণ্ঠনমূলক ব্যয় বৃদ্ধি তথা দূর্নীতি নিয়ন্ত্রণ না হওয়ায় সরকারি

ভর্তুকি ও ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। ফলে জ্বালানির ওপর ভোক্তার স্বত্বাধিকার সংকটে এবং ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণ অনিশ্চিত।

বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলেও খাদ্যের ওপর ভোক্তার স্বত্বাধিকার নিশ্চিত হয় না। খাদ্যের মূল্য ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকতে হয়, নইলে খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। ঠিক এই একইভাবে বলা যায়, জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হলেই জ্বালানির ওপর ভোক্তার স্বত্বাধিকার নিশ্চিত হয় না, তা অবশ্যই ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকতে হয়। অন্যথায় ভোক্তা জ্বালানি নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে খাদ্যের ওপর ভোক্তার স্বত্বাধিকার বিবেচনা করা হয়। অথচ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে জ্বালানির ওপর ভোক্তার স্বত্বাধিকার সুরক্ষা বিবেচনায় আসে না। ফলে ভর্তুকিতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি। বরং সমগ্র জ্বালানি সাপ্লাই সিস্টেম ক্রমাগত দুর্নীতি সম্পৃক্ত হচ্ছে। মূল্য বৃদ্ধি ও ভর্তুকি তাতে জ্বালানি হিসেবে কাজ করছে এবং কার্বনযুক্ত জ্বালানির বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ নবায়নযোগ্য জ্বালানির তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন স্বার্থ সংঘাতের শিকার। ফলশ্রুতিতে জ্বালানি নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিপন্ন হওয়ায় ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণ এখন সংকটে।

ক্রমাগত বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমদানিকৃত তরল জ্বালানি, কয়লা ও এলএনজি সরবরাহ বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। তাছাড়া প্রকৃত চাহিদার সাথে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই দুই কারণে জ্বালানি সরবরাহ ব্যয় অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানি বাজার প্রতিযোগিতাহীন হওয়ায়

ইউটিলিটি ও রেগুলেটরি পর্যায়ে সক্ষমতা উন্নয়ন সংকটে রয়েছে। ফলে জ্বালানি সিস্টেম দুর্নীতি মুক্ত হচ্ছে না, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জ্বালানি সরবরাহে কার্বন সম্পৃক্ত জ্বালানি ব্যবহার এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি অনিয়ন্ত্রিত। এমন অবস্থায় একদিকে পরিবেশ সংরক্ষণ যেমন বিপন্ন, অন্যদিকে পরিবেশ ও ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল্যবোধ অবক্ষয়ের শিকার। ফলে সমাজের প্রতিবাদী চরিত্র এখন বড় বেশি হুমকির সম্মুখীন। সুতরাং পরিবেশ ও ইকো-সিস্টেম সংরক্ষণে জ্বালানি রূপান্তরে অর্থনীতি কার্বন ও দুর্নীতি উভয়ই মুক্ত হওয়া সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০০৮ অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ২০২১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল সরবরাহকৃত বিদ্যুতের ১০ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্রিডে সরবরাহকৃত মোট বিদ্যুতের পরিমাণ ধরা হয় প্রায় ৭৯ বিলিয়ন ইউনিট। অথচ তখন গ্রিডে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের অনুপাত ছিল ০.০৯%। ২০২০-২১ অর্থবছরে তা ০.২০%। তাছাড়া উৎপাদন ব্যয়বহুল (প্রতি ইউনিট ৬০ টাকা) হওয়ায় সোলার মিনিগ্রিড বিদ্যুৎ এবং ব্যয়বহুল (প্রতি ইউনিট প্রায় ৮০ টাকা) ও মানসম্মত না হওয়ায় সোলার হোম সিস্টেম বিদ্যুতের বাজার এখন বিলুপ্তির পথে এবং মূল্যহার অত্যধিক হওয়ায় উক্ত বিদ্যুতের ওপর জনগণের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাজার উন্নয়নে সফল হওয়া যায়নি।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০-এর কারণে জ্বালানি মার্কেট প্রতিযোগিতাহীন। ফলে ভোক্তা জ্বালানি অধিকার বঞ্চিত। জ্বালানি সংকট মোকাবেলার

অজুহাতে ২ বছর মেয়াদে এই আইন করা হলেও মেয়াদ বারংবার বৃদ্ধি করে আজও বলবৎ রাখা হয়েছে। তাতে চলমান রূপান্তরে জ্বালানি উন্নয়ন ব্যয় অন্যায় ও অযৌক্তিক এবং সামঞ্জস্যহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভোক্তা লুণ্ঠনমূলক মূল্যে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণকারী সংস্থা নিষ্ক্রিয় এবং আইন ও বিধি-বিধান অনেক ক্ষেত্রেই অকার্যকর।

দেশে দেশে কার্বনমুক্ত অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্যে সংগ্রাম চলছে। সে লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী কার্বনযুক্ত জ্বালনি কার্বনমুক্ত জ্বালানি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জ্বালানি সংরক্ষণে উন্নয়ন হচ্ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ কার্বনমুক্ত অর্থনীতি তৈরির লক্ষ্যে ১৯৯০ সাল থেকে অনেক দেশে জ্বালানি চাহিদা প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধনাত্মক- এই ধারা অব্যাহত আছে। অর্থাৎ নানা রূপান্তরের আওতায় নানা পরিবর্তন দ্বারা ব্যবহৃত জ্বালানিতে একদিকে কার্বন কমানো অব্যাহত আছে, অন্যদিকে দক্ষতা ও সংরক্ষণ উন্নয়নের কারণে জ্বালানি ব্যবহার বা চাহিদা ক্রমাগত কমছে। কিন্তু দেশে জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুতের চাহিদা বর্তমানে কম বেশি ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭ শতাংশের অধিক। অর্থাৎ ১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়োজন প্রায় ১.৪ শতাংশ। অথচ অনেক দেশের ক্ষেত্রে তা ০.৬ শতাংশের আশপাশে। অর্থাৎ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ উন্নয়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে এখনও উন্নীত হয়নি। সার্বিক বিবেচনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন এবং জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার এক বৈরী পরিস্থিতি এবং কায়েমি স্বার্থের শিকার।

প্রতিযোগিতাহীন বিদ্যমান জ্বালানি বাজারে মানসম্মত বিনিয়োগ হচ্ছে না। অনবায়নযোগ্য গ্রিড বিদ্যুতে ভর্তুকি থাকায়

নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ বাজার উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার। অফ গ্রিড এলাকায় ভোক্তা নির্বিশেষে প্রতি ইউনিট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ৩০ টাকায় ক্রয় করে। অথচ ভোক্তা ভেদে গ্রিড বিদ্যুৎ ভর্তুকিতে বিক্রি হয় ৩.৭৫-১১.০০ টাকায়। পশ্চাদপদ অফ-গ্রিড ভোক্তা একদিকে মূল্যহার বৈষম্যের শিকার, অন্যদিকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ অসম বাজার প্রতিযোগিতার শিকার। টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী স্রেডার কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের রেগুলেটর হিসেবেও স্রেডা দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণের দায়িত্ব গ্রিড বিদ্যুৎ ইউটিলিটিসমূহের ওপর অর্পিত। ফলে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ বাজার স্বার্থ সংঘাতের শিকার। অফ-গ্রিড নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যবসায়ীদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গণ্য করা যায় না। তারা মূলতঃ ফিনান্সিয়াল ইন্সিটিটিউট 'ইডকল'-এর ঠিকাদার মাত্র। তারা প্রকল্প প্ল্যান ও ডিজাইন এবং গ্রহণে স্বাধীন নয়। সুতরাং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উদ্যোক্তার সক্ষমতা উন্নয়ন উদ্যোগ অনুপস্থিত।

জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণ ও ভোক্তা অভিযোগ নিষ্পত্তিতে রেগুলেটরি বডি স্রেডা, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বিইআরসি, দুদক এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন অকার্যকর। বিইআরসি আইনের ৩৪(২)(খ) উপধারা অনুযায়ী জ্বালানির মূল্যহার রাজস্ব চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু রাজস্ব চাহিদা একদিকে যৌক্তিক চাহিদার তুলনায় বেশি দেখানো হয়, অন্যদিকে জ্বালানির মূল্য ওই বর্ধিত রাজস্ব চাহিদা অপেক্ষা বেশি নির্ধারণ করা হয়। প্রবিধান মতে ইউটিলিটির রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে জ্বালানি উত্তোলন, উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহণ ও বিতরণ ন্যূনতম ব্যয়ে নিশ্চিত

হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণের এ-বিধান বিবেচনায় আসে না।

জ্বালানি উত্তোলন, উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহণ ও বিতরণে ব্যবহৃত ও ব্যবহাযোগ্য সম্পদের মূল্য ধরে জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। জ্বালানি সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন পর্যায়ে যৌক্তিক চাহিদার তুলনায় অবকাঠামোগত ক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণহীন। ফলে জ্বালানি উৎপাদন/উত্তোলন এবং সরবরাহের বিভিন্ন সেগমেন্টের ক্ষমতা আংশিক ব্যবহার হয় বা কখন কখন অব্যবহৃতও থাকে। তাতে জ্বালানি সরবরাহে লুণ্ঠনমূলক ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং লুণ্ঠনমূলক মূল্য বৃদ্ধি হয়। যদিও জ্বালানি সরবরাহ ব্যয়ের যতটুকু জ্বালানির মূল্যহারে সমন্বয় করা ন্যায্য ও যৌক্তিক বলে গণশুনানিতে বিবেচিত হবে, ততটুকু সমন্বয় করে মূল্যহার নির্ধারণ করার একক এখতিয়ার বিইআরসি'র। অথচ গণশুনানিতে প্রতিষ্ঠিত ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা উপেক্ষা করে বিইআরসি লুণ্ঠনমূলক ব্যয় সমন্বয় করে জ্বালানির মূল্যহার বৃদ্ধি করে। তাতে ভোক্তা একদিকে অধিকার বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে অসাধু ব্যবসা সুরক্ষা পায় ও উৎসাহিত হয়।

মূল্যহার লুণ্ঠনমূলক হওয়ায় জ্বালাানি ইউটিলিটি ও সংস্থায় প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা বাড়তি সঞ্চয় হয়। আবার জ্বালানি বিভাগ কর্তৃক এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে নির্ধারিত লুণ্ঠনমূলক মূল্যহার ৭ বছরের বেশি সময় ধরে বলবৎ রেখে বিপিসি ৪৩,৭৩৪.৭৮ কোটি টাকা লুণ্ঠনমূলক মুনাফা করে। জ্বালানি বিভাগ এক যুগের বেশি সময় ধরে বিইআরসিকে এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণে বিরত রেখে লাইসেন্সিদের ইচ্ছামাফিক লুণ্ঠনমূলক মূল্যহারে এলপিজি বিক্রির সুযোগ দেয়। এনবিআর-এর ১৯৯৩ সালের এসআরও মতে আইওসি'র গ্যাস সম্পূরক শুল্ক ও মূসক মুক্ত হলেও রাজস্ব চাহিদায় তা সমন্বয় করে গ্যাসের লুণ্ঠনমূলক মূল্যহার নির্ধারণ ২০১৮ সাল অবধি অব্যাহত ছিল। তাতে

ভোক্তাদের নিকট থেকে পেট্রোবাংলা লুণ্ঠনমূলক সম্পদ আহরণ করেছে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল, এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ ইউটিলিটিসমূহের রাজস্ব চাহিদা হ্রাসে অনুদান হিসেবে বিনিয়োগের পরিবর্তে ঋণ হিসাবে দেখনো হয়। তাতে জ্বালানির লুণ্ঠনমূলক সরবরাহ ব্যয়বৃদ্ধি পায় এবং লুণ্ঠনমূলক মূল্যহার বৃদ্ধি হয়। জ্বালানি সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অনুদান হিসেবে বিনিয়োগের জন্য ভোক্তাদের অর্থে ওই সব তহবিল গঠিত হয়। অথচ সে-সব তহবিল এখন মূল্য ও ভর্তুকি বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক। এ-ভাবেই ভোক্তা লুণ্ঠিত ও জ্বালানি অধিকার বঞ্চিত।

মোট সরবরাহকৃত বিদ্যুতের প্রায় ৫৬ শতাংশ বিদ্যুৎ আরইবি'র মাধ্যমে বিতরণ হয়। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন ১৯৭৭ এর আওতায় রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করার লক্ষ্যে আরইবি প্রতিষ্ঠিত হয়। আরইবি'র আওতায় গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ ইউটিলিটি হিসেবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ (পিবিএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিতরণ ব্যবস্থা আনবান্ডলিং করা চলমান জ্বালানি রূপান্তরের উদ্দেশ্যাবলীর একটি। অথচ আরইবি গ্রামের সীমানা পেরিয়ে শহর এলাকায়ও সম্প্রসারিত হচেছ। এমন কি অফ গ্রিড নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ বিতরণ এলাকায় গ্রিড বিদ্যুৎ বিতরণ সম্প্রসারণ করে এ-বিদ্যুতের বাজার বিনষ্ট করছে। তাতে বিতরণ ব্যয় ও ভর্তুকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ সংকট নিরসন হচ্ছে না।

আয়-ব্যয় ও পারফর্মেন্স ভেদে কোম্পানি আইনে পরিচালিত সরকারি মালিকানাধীন ইউটিলিটির বেতন, ভাতা, সুযোগ-সুবিধাদি ও মুনাফা মার্জিনে তারতম্য থাকবে। অথচ বিদ্যুৎ বিভাগ এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে পিবিএস-সমূহ এবং

অন্যান্য ইউটিলিটি সমূহের বেতন, ভাতা ও সুযোগ-সুবিধাদি এবং মুনাফা মার্জিন এক দিকে অভিন্ন রেখেছে, অন্যদিকে ভর্তুকিতে চললেও বেতন ভাতাদি লাভজনক কোম্পানির মত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। গণশুনানিতে ভোক্তাপক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও বিইআরসি এই বৃদ্ধিজনিত ব্যয় সমন্বয় করে বিতরণ চার্জ বৃদ্ধি করে। ফলে ইউটিলিটির দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নে রেগুলেটরি সংস্থা বিইআরসি'র কোন কার্যকর ভূমিকা নেই।

২০১৯ সালে গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায়, গণশুনানির ভিত্তিতে মূলত সঞ্চালন ও বিতরণ চার্জহার নির্ধারণ করা হয়। তা গ্যাসের মূল্যহারের মাত্র ৫.৩৫ শতাংশ এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ১৭.৩৯ শতাংশ। এ তথ্যে প্রতীয়মান হয়, ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যহার নির্ধারণে বিইআরসি আইন কত বেশি সীমাবদ্ধ। নির্ধারিত রাজস্ব চাহিদাহার অপেক্ষা অধিক চার্জহার নির্ধারণ করে ইউটিলিটি সমূহকে বাড়তি আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়। তিতাস গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানির চাহিদা হার ৫ পয়সা। পায় ২৫ পয়সা। অর্থাৎ বাড়তি তথা অনুপার্জিত বা লুণ্ঠনমূলক মুনাফার পরিমাণ বছরে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। গ্যাসের উৎস নিশ্চিত না থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ-পশ্চিাঞ্চলের ৭টি জেলায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। সে-সব লাইন অব্যহৃত, মাটি চাপা পড়ে আছে। ভেড়ামারা-খুলনা এবং বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস লাইনের সঞ্চালনক্ষমতা স্বল্প ব্যবহার হয়। বিতরণ ও হুইলিং চার্জহার নির্ধারণে এ-সব লাইন শতভাগ ব্যবহারই ধরা হয়। ফলে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয়হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫ সালে হুইলিং চার্জ ছিল ১৫ পয়সা। ২০১৯ সালে চার্জহার নির্ধারণ করা হয় ৪২.৩৫ পয়সা, অর্থাৎ বৃদ্ধি পায় প্রায় ৩ গুণ। এমন সব চার্জহার লুণ্ঠনমূলক বলেই বিবেচিত এবং গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

বিইআরসি'র মূল্যহার নির্ধারণ আদেশে দেখা যায়, রাষ্ট্রয়াত্ত কোম্পানি বাপেক্স-এর নিকট থেকে কেনা গ্যাসের ক্রয় মূল্যহার ৩.০৪১৪ টাকা। অথচ আইওসি'র নিকট থেকে কেনা গ্যাসের ক্রয় মূল্যহার ২.৫৫ টাকা। বাপেক্সকে উপেক্ষা করে বিদেশি কোম্পানি দ্বারা কয়েকগুণ বেশি ব্যয়ে স্থলভাগের গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের কাজ করানো হয়। অথচ বাপেক্সকে দিয়ে সে-কাজ করানো হলে ব্যয়হার ১.৫০ টাকার বেশি হতো না। এমনকি পিএসসি'র আওতায় এ কাজ করানো হলেও ব্যয় অনেক কম হতো। দেশীয় কোম্পানির পরিবর্তে বিদেশি কোম্পানির মাধ্যমে গ্যাস ও কয়লা উত্তোলনের ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজস্ব গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে সরকারের মনোযোগ নেই। তরল জ্বালানি, কয়লা ও এলএনজি আমদানিতেই বেশি মনোযোগ।

ইতোমধ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে সরকার আংশিক সরে এসেছে। জ্বালানি চাহিদা পূরণে এলএনজি আমদানি বৃদ্ধিতে এখন সরকার বেশি মনোযোগী। ২০২০ সালে বিইআরসি কর্তৃক মূল্যহার নির্ধারণ আদেশ অনুযায়ী সরবরাহকৃত গ্যাসে এলএনজি'র পরিমাণ কম-বেশি ২৩ শতাংশ। এলএনজি-মিশ্রিত গ্যাসের গড় মূল্যহার ১২.৬০ টাকা। উক্ত গ্যাসের ৪৫ শতাংশ ৪.৪৫ টাকা মূল্যহারে গ্রিড বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার হয়। তাতে বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস বাবদ ভতুর্কি প্রায় ৪ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা।

গত ২০২০-২১ অর্থবছরে পাইকারি বিদ্যুতে ভর্তুকি ছিল ৭ হাজার ৫৮৬ কোটি টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ গ্যাসসহ সর্বমোট ভতুর্কি ১৩,৬৫০ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ উৎপাদন (আমদানি ব্যয়সহ) ব্যয়হার গড়ে ৭.৩০ টাকা। এই ব্যয়হার অপেক্ষা আমদানিকৃত কয়লা,

তেল, এলএনজি, কিংবা নিউক্লিয়ার জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়হার অনেক বেশি হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতি একক বিদ্যুৎ আমদানি ব্যয় ছিল ৫.৮২ টাকা। গত শতাব্দীর শেষ দিকে বিদ্যুৎ আমদানির চেষ্টা চলে। ভর্তুকি বাড়তো বিধায় সে চেষ্টা থেমে যায়। অথচ এখন আমদানিকৃত বিদ্যুৎ লাভজনক এবং ভর্তুকি হ্রাসের নিয়ামক।

২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়হার ছিল গড়ে ৭.৩০ টাকা এবং পাইকারি বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্যহার গড়ে ৫.১২ টাকা। ঘাটতিহার ২.১৮ (১৫,৪৬০ কোটি) টাকা। ৩৩ কেভি লেভেলে ওই বিদ্যুৎ বিক্রি হয় বিতরণ ইউটিলিটিঃ পিডিবি, আরইবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওজোপাডিকো, ও নেসকোর নিকট। মূল্যহার (বিদ্যুতের অনুপাত) যথাক্রমে ৫.৯০৮৮ (১৭.৫৫%), ৪.৩৬৭৯ (৪৯.৮৯%), ৬.৪৫২৩ (৮.০৫%), ৬.৪৫৩১ (১৩.৫৭%), ৫.৩৭৭১ (৫.১৬%) এবং ৫.০৫৪৪ (৫.৭৮%) টাকা। অর্থাৎ শতভাগ বিদ্যুৎ ইউটিলিটি ভেদে কম-বেশি লোকসানে বিক্রি হয়। সরকারি ভর্তুকিতে সে-লোকসান সমন্বয় হয়। ব্যক্তি খাত থেকে ৩৩ কেভি লেভেলে ক্রয়কৃত বিদ্যুৎ বিবেচনা করা হলে আরইবি গত অর্থবছরে প্রায় ৫৬% বিদ্যুৎ ৯,৫৭৪ কোটি টাকা ভর্তুকিতে বিতরণ করে। তবে শহর ও গ্রামের ভোক্তাদের মধ্যে মূল্যহারে কোন তারতম্য নেই। ভোক্তা পর্যায়ে অন্যান্য বিতরণ ইউটিলিটির এলাকায় আরইবি'র সম্প্রসারণ এবং সম্প্রতি আরইবি এলাকার ১৩২ কেভি লেভেলের শিল্প ভোক্তাকে পিডিবি থেকে আরইবি'কে দেওয়ায় পাইকারি বিদ্যুতে আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি হবে, এবং ভর্তুকি আরো বাড়বে। চলমান জ্বালানি রূপান্তরে লাভজনক করা লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ একদিকে বিভাজিত হচ্ছে, অন্যদিকে আরইবি'র আওতায় একীভূত হয়ে লোকসান বাড়াচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ বাণিজ্যিকীকরণ উদ্যোগ সফল হয়নি।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের হিসেবে দেখা যায়, ফার্নেস অয়েল, ডিজেল, নিজস্ব কয়লা এবং সোলার থেকে গ্রিড বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়হার যথাক্রমে ১৪.৮৯, ১৭৬.৬৬, ৬.৬২ এবং ১১.৮২ টাকা। বিদেশি কয়লায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়হার (কার্বন কর ব্যতীত) ১০.৮২ টাকা। এ-সব ব্যয়হার অপেক্ষা গ্রিড সৌর বিদ্যুতের মূল্যহার এখন অনেক কম। ব্যক্তি খাতে সে বিদ্যুৎ বিক্রি হয় ৭ টাকারও কমে। ভারতে ভারতীয় মুদ্রায় ৩.১৭ টাকা। প্রায় ৩৫ শতাংশ বিদ্যুৎ তরল জ্বালানি থেকে উৎপাদন হয়। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ এবং সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন করা হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয় হ্রাস পেতো। ভতুর্কির পরিমাণ অনেক কম হতো। অথচ ব্যয়বৃদ্ধি লুণ্ঠনমূলক হলেও নিয়ন্ত্রণে কোন উদ্যোগ নেই।

দেশীয় কয়লার মূল্যহার নির্ধারণ করে জ্বালানি বিভাগ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই কয়লা বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ক্রয় করে প্রায় ১৫০ ডলার মূল্যহারে। অথচ পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কয়লার মূল্যহার তখন ছিল ১০০ ডলার। আবার বড়পুকুরিয়া ও পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় যথাক্রমে ৬.৬২ এবং ১০.৮২ টাকা। প্ল্যান্ট ফ্যাক্টরে উল্লেখযোগ্য তারতম্য না থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন ব্যয়ে এমন তারতম্য অস্বাভাবিক।

স্রেডা আইনের ৬(১৭) ধারা মতে গণশুনানির ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণের এখতিয়ার বিইআরসি'র। অথচ এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে সে-মূল্য নির্ধারণ করে বিদ্যুৎ বিভাগ। তাতে দেখা যায়, বিদ্যুৎ ক্রয় বা বিক্রয় মূল্য অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিকভাবে নির্ধারণ করা হয় যা প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(২)(ক)(অ) উপধারা মতে বাজারে প্রতিযোগিতার পরিপন্থী।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, সে উৎপাদনে দেশীয় জ্বালানির অনুপাত হ্রাস এবং আমদানিকৃত জ্বালানির অনুপাত বৃদ্ধি অব্যহত থাকা, প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় জ্বালানি অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া এবং সেই সাথে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত বৃদ্ধির কারণে আর্থিক ঘাটতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সে-ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে মূল্যহার ও ভতুর্কি উভয়ই বৃদ্ধি অব্যহত আছে। ফলে অব্যাহত এই ঘাটতি বৃদ্ধির অভিঘাতের শিকার একদিকে অর্থনীতি, অন্যদিকে ভোক্তাঅধিকার।

চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন, সঞ্চালন বা বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি না হওয়ায় সে ক্ষমতা অনেকাংশে অব্যবহৃত থাকে। ক্ষমতা যতুটুকু ব্যবহার হয়, ততটুকু ধরে যদি রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণ করা হতো, তাহলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকতো। অসাধু ব্যবসা বা দুর্নীতি রোধ করা সহজ হতো। ধারণা করা হয়, ২০২৪ সালে প্রায় ৬৭ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকবে। তাই যে সব উৎপাদন ও সঞ্চালন ক্ষমতা উন্নয়নে রয়েছে, তাদের সিওডি ২০৩০ সালের পর ঘোষণা করার প্রস্তাব ছিল। অথচ বিদ্যুৎ বিভাগ সে-প্রস্তাব আমলে নেয়নি। বরং তারা বিদ্যুৎ রপ্তানিতে এখন তৎপর।

২০৩০ সাল নাগাদ অব্যবহৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, ও বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার কারণে আর্থিক ঘাটতি বৃদ্ধি আরো প্রকট হবে। ২০১০ সালে যে বিতরণ ইউটিলিটির ৪ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ছিল ২০১৮ সালে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি দ্বিগুণ না হলেও সে সম্পদ প্রায় ৩.৫ গুণ বেড়ে হয় ১৪ হাজার কোটি টাকার। ৮ বছরের ব্যবধানে বিদ্যুৎ বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি সামঞ্জস্যহীন এবং অস্বাভাবিক। এই একই বক্তব্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চাহিদার অতিরিক্ত এবং অত্যধিক অস্বাভাবিক ব্যয়ে জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রতি কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণে ব্যয় হয় ভারতে ৯৮ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশে ১০ কোটি টাকা। ক্যাবের মতে, ২০২০ সালের আদেশে ন্যায্য ও যৌক্তিক রাজস্ব চাহিদা অপেক্ষা বছরে প্রায় ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বেশি সমন্বয় করে বিইআরসি বিদ্যুৎ বিতরণ চার্জহার নির্ধারণ করে এবং প্রায় ৮ হাজার কোটি অযৌক্তিক ব্যয় সমন্বয় করে বাল্ক বিদ্যুতের রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণ করে। এই একই অবস্থার শিকার তেল, গ্যাস ও কয়লা।

গণশুনানিতে বিদ্যুৎ সঞ্চালনে গ্রহণযোগ্য আর্থিক ঘাটতি প্রমাণিত না হওয়ায় সঞ্চলন চার্জহার বৃদ্ধিতে ভোক্তাদের আপত্তি ছিল। তা সত্ত্বেও বিইআরসি ২০১৫ সালের আদেশে সঞ্চালন চার্জহার ২১ শতাংশ বৃদ্ধি করে। ২০২০ সাল থেকে যৌক্তিক ব্যয়ে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য না রেখে যেভাবে সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে অচিরেই সঞ্চালন চার্জহার বৃদ্ধি অস্বাভাবিক এবং নিয়ন্ত্রণহীন দৃশ্যমান হবে।

ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্যহার পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিইআরসি ২০২০ সালের আদেশে ন্যায্য ও যৌক্তিক রাজস্ব চাহিদা অপেক্ষা বছরে প্রায় ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বেশি সমন্বয় করে বিতরণ চার্জহার নির্ধারণ করে। এই অর্থের বেশির ভাগই আরইবি'র বিতরণ চার্জহারে সমন্বয় হয়। পিডিবি, আরইবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওজোপাডিকো, ও নেসকো'র ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিতরণ চার্জহার যথাক্রমে ০.৯২, ১.৪৩, ০.৮২, ০.৮৭, ১.০৭ এবং ১.০৩ টাকা। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়হার তথা গড়ক্রয় মূল্যহার ৭.৩০ টাকা (ভর্তুকি ব্যতীত), সঞ্চালন চার্জহার ০.২৯৪৪ টাকা এবং বিতরণ চার্জহার সমন্বয়ে ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয়হার (ভর্তুকি ব্যতীত) পিডিবি, আরইবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওজোপাডিকো, ও নেসকো'র আওতাধীন ভোক্তাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮.৫৪৪৪, ৯.০৫৪৪, ৮.৪৪৪৪, ৮.৪৯৪৪, ৮.৬৯৪৪, এবং ৮.৬৫৪৪ টাকা।

বিদ্যুতের মূল্যহার ভোক্তা পর্যায়ে শ্রেণিভেদে তারতম্য রয়েছে। তবে পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার ইউলিটি ভেদে তারতম্য থাকলেও ভোক্তা পর্যায়ে শ্রেণিভিত্তিক খুচরা মূল্যহারে কোন তারতম্য নেই। খুচরা বিদ্যুতের মূল্যহার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ভোক্তাভেদে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যহার–বাণিজ্যে ১০.৩০ টাকা, শিল্পে ভোল্টেজ লেভেল ভেদে (১১, ৩৩ ও ১৩২ কেভি) যথাক্রমে ৮.৫৫-৮.৩৬ টাকা এবং ক্ষুদ্র শিল্পে ৮.৫৩ টাকা। ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্যিক ভোক্তা ট্যারিফ বৈষম্যের শিকার। সেচ ও প্রান্তিক আবাসিক ভোক্তারা ভর্তুকিতে বিদ্যুৎ পায়। ইউটিলিটি ভেদে সে ভতুর্কি ক্রস-সাবসিডির মাধ্যমে অংশ বিশেষ সমন্বয় হয়। বাদবাকি ভতুর্কি সরকার দেয়। বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি শিল্প তথা উৎপাদনশীল খাতে হতাশাজনক এবং অনুৎপাদশীল খাতে উদ্বেগজনক।

ডেসকো ও ডিপিডিসির তুলনায় অন্যান্য বিতরণ ইউটিলিটির এলকায় বিদ্যুৎ সেবায় ভোক্তা সন্তুষ্টি কম। ভোক্তা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের শিকার। আবার অন্যান্য ইউটিলিটির এলাকার তুলনায় আরইবির এলাকায় ভোক্তা সন্তুষ্টি আরো কম। আরইবির বিতরণ ব্যবস্থা অন্যান্য ইউটিলিটির তুলনায় বেশি দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ। বিগত ১০ বছরে লাইন মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় ১৩৭ জন বিদ্যুৎ কর্মী। বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ন্ত্রণহীন। ভোক্তার বিদ্যুৎ বিলে সব ইউটিলিটিতেই কম-বেশি কারচুপি হয় এবং ভোক্তারা প্রতারিত।

গ্রাহকদের মধ্যে মাসে ০-৫০ ইউনিটের ভোক্তারা নূন্যতম মূল্যহারের, ৩.৭৫ টাকা/ইউনিট, বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা পান। হত দরিদ্র ভোক্তা যদি ১টি ২০ ও ১টি ১০ ওয়াটের বাল্ব দিনে ৪ ঘণ্টা ব্যবহার করে, তাহলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য তার ব্যয় হবে ২৩ টাকা। সরকার প্রান্তিক ভোক্তাকে স্বল্প মূল্যে বিদ্যুৎ দিলেও ট্যারিফ নির্ধারণে বিভ্রান্তির কারণে ভোক্তা

সে সুবিধাবঞ্চিত। মিটার কেনা-বেচায় অসাধু ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। সে অভিযোগে সব ইউটিলিটিই কম/বেশি অভিযুক্ত।

ক্যাব-এর অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয়, ৩৩ কেভি ভোল্টেজ লেভেলে সামিট পাওয়ার লিঃ এর বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যাপারে আরইবি'র সাথে সম্পাদিত একটি সম্পূরক চুক্তি এবং সামিট পাওয়ার লিঃ এর মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যাপারে পিডিবি'র সাথে সম্পাদিত অপর একটি সম্পূরক-চুক্তি মূল-চুক্তিসমূহের পরিপন্থি, এবং অবৈধ। এ-সব সম্পূরক চুক্তির ভিত্তিতে আরইবি কর্তৃক ক্রয়কৃত বিদ্যুতের বিল পরিশোধে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং পিডিবি কর্তৃক ক্রয়কৃত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে বিইআরসি'র আপত্তি রয়েছে। অথচ সম্পূরক চুক্তি দু'টি বাতিল হয়নি। ক্যাব এই দুটি চুক্তি বাতিলের জন্য বিইআরসি'র নিকট আবেদন করেছে। কিন্তু বিইআরসি নিষ্ক্রিয়।

ইউটিলিটির রাজস্ব চাহিদার অতিরিক্ত গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল বাবদ বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত চার্জসমূহ যথাক্রমে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের সাথে ভোক্তাদের নিকট থেকে আদায় করা হয়। আবার ওই তহবিলের অর্থ রাজস্ব চাহিদায় ৩% সুদে ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ দেখানো হয়। তাতে ভোক্তাদের আপত্তি রয়েছে। এই সব তহবিলের উদ্দেশ্য, ঋণ হিসাবে নয়, উৎপাদন/আমদানি পর্যায়ে অনুদান হিসাবে তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা এবং গ্যাস, তেল ও বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয় কমিয়ে মূল্যহার কমানো। বিইআরসি সে দাবি আমলে না নেয়ায় ভোক্তারা এ-তহবিলের বিলুপ্তি চায়।

বড়পুকুরিয়া খনির কয়লা আত্মসাতের অভিযোগ পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি বিভাগের তদন্তে প্রমাণিত হয়নি। তাদের তদন্তে চুরি বা আত্মসাৎ নয়, সিস্টেম লসের কারণে কয়লা ঘাটতি প্রমাণিত হয়। কিন্তু ক্যাব-এর অনুসন্ধানে উক্ত সিস্টেম লস সমন্বয়ের

পরও ৫ লক্ষ টনের অধিক পরিমাণ কয়লা ঘাটতির কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তাতে প্রতিভাত হয়, এই পরিমাণ কয়লা তছরুফ হয়েছে। উক্ত অনুসন্ধানে আরো প্রমাণ পাওয়া যায়, বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রকৃত কন্‌জাম্পশনের তুলনায় ৫ শতাংশ কয়লা বেশি কন্‌জাম্পশন দেখানো হয়। উক্ত কয়লা আত্মসাতের অভিযোগটি এখন ফৌজদারি আদালতে বিচারাধীন।

ঘুষের বিনিময়ে সম্পাদিত বাপেক্স-নাইকো যৌথ চুক্তি হাইকোর্ট বাতিল করেছে। জ্বালানি বিভাগের সাবেক সচিবগণের ওই চুক্তিতে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। চুক্তিতে সংশ্লিষ্টরা দুর্নীতির দায়ে এখন ফৌজদারি আদালতে বিচারাধীন। মাগুরছড়া গ্যাস ফিল্ডের ব্যাপারে অক্সিডেন্টাল-এর সাথে সম্পাদিত সম্পূরক চুক্তি ব্যাপারেও অনুরূপ অভিযোগ রয়েছে। এ-চুক্তি বাতিলের জন্য দায়েরকৃত রিট মামলা উচ্চ আদালতে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

ক্যাবের অনুসন্ধানে উদ্ঘাটিত হয়, বাপেক্সের কারিগরি কমিটির আপত্তি উপেক্ষা করে জ্বালানি সচিবের একক উদ্যোগে আইওসি সান্তোসের সাথে মগনামা-২ অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য সম্পূরক চুক্তি সম্পাদন হয় এবং সে চুক্তি অবৈধ। তাতে সরকার প্রায় ২৬২ কোটি টাকার ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়। ক্যাব এ-চুক্তি বাতিলের দাবি করেছে।

ফুলবাড়ী কয়লা খনি উন্নয়নের ব্যাপারে এশিয়া এনার্জির সাথে পেট্রোবাংলার অনুরূপ অবৈধ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ-চুক্তিতেও তৎকালীন জ্বালানি সচিবের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। ২০০৬ সালে গণ-আন্দোলনের মুখে সরকার এ-চুক্তি বাতিলের অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে। গণ-আন্দোলনের মুখে ভারতে গ্যাস রপ্তানির চেষ্টা থেমে যায়। পরবর্তীকালে বড়পুকুরিয়ায়

উন্মুক্ত কয়লা খনি করা এবং কয়লা ও সার ভারতে রপ্তানি করার প্রকল্প প্রস্তাব গণদাবীর মুখে টাটা নিজেই প্রত্যাহার করে। এ-সব ঘটনাবলীতে জাতীয় সম্পদ রক্ষায় জাতীয় সক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে সম্পদ জনস্বার্থে ব্যবহারের লক্ষ্যে সক্ষমতা উন্নয়ন উদ্যোগ অনুপস্থিত।

সংবিধান পরিপন্থি হলেও লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ইউটিলিটিগুলো ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। লোকসানে থাকা ইউটিলিটিগুলো সরকারের হাতেই থেকে যাবে এবং ভর্তুকি বাড়বে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ইউটিলিটির কিছু শেয়ার ইতোমধ্যে ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ক্যাপাসিটি চার্জের বিনিময়ে অযাচিত ব্যক্তিখাত বিনিয়োগে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অপরিকল্পিত উন্নয়ন বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করেছে এবং অসাধু ব্যবসা সম্প্রসারণ হয়েছে। বিতর্কিত রেন্টাল ও কুইকরেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি ও চুক্তির মেয়াদ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ এর মেয়াদ দফায় দফায় বৃদ্ধি তারই প্রমাণ।

সংবিধান-পরিপন্থি হলেও প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ পলিসি'র আওতায় সরকার ব্যক্তি খাতের সাথে যৌথ মালিকানায় ব্যবসা করে। এই পলিসি'র আওতায় এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত। এই কোম্পানির এমডি ও বোর্ডের প্রাইভেট পক্ষের পরিচালকের বিরুদ্ধে উক্ত কোম্পানির অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নিষ্পত্তি করেনি। তার কোন প্রতিকার হয়নি। কারণ ওই বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব এই কোম্পানির চেয়ারম্যান। সুতরাং জ্বালানি বিভাগ স্বার্থসংঘাতযুক্ত।

এলপিজি কোম্পানি, ওমেরা'র মালিক সরকারের সাথে যৌথ মালিকানায় এমজেএল নামের একটি মবিল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এলপিজি ব্যবসায়ী সমিতি 'লোয়াব' এর

সভাপতি। 'ওমেরা' ওই মবিল কোম্পানির অধীনস্ত অপর একটি কোম্পানি। জ্বালানি সচিব পদাধিকার বলে উক্ত মবিল কোম্পানির সভাপতি। সুতরাং এলপিজি'র মূল্য লাইসেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া, এলপিজি লাইসেন্সি হতে হলে লোয়াব-এর সদস্য হওয়ার বিধান, এলপিজি লাইসেন্সিদের স্বার্থে জ্বালানি বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন, উচ্চ আদালতের নির্দেশে বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত এলপিজির মূল্যহার কার্যকর না হওয়া এবং ব্যবস্থা গ্রহণে বিইআরসি'র নিষ্ক্রিয়তা– এসব ক্ষেত্রে জ্বালানি বিভাগ ও বিইআরসি স্বার্থসংঘাতযুক্ত। ফলে জ্বালানির বাজারে প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত।

বিইআরসি আইনের ৩৪ ধারা মতে এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণের একক এখতিয়ার বিইআরসি'র। অথচ সে-মূল্যহার এলপিজি লাইসেন্সিরা স্বীয় বিবেচনায় বিগত এক যুগের বেশি সময় ধরে নিজেরাই নির্ধারণ করে লুণ্ঠনমূলক মুনাফা করেছে এবং ভোক্তারা ঠকেছে। বিইআরসি নিষ্ক্রিয় থেকেছে। আদালতের নির্দেশে সে-মূল্যহার বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত হলেও তা কার্যকর করতে বিইআরসি সক্ষম হয়নি। বিইআরসি আইনের ৪২ ও ৪৩ ধারা মতে বিইআরসি আইন ও আদেশ লঙ্ঘন করা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। বিইআরসি আইনের ৪৭ ধারা মতে ক্যাব ওই উভয় অপরাধের বিচার চেয়েছে। অথচ বিইআরসি নিষ্ক্রিয়।

বিইআরসি আইনের ২৭(২) উপধারা মতে বিপিসি বিইআরসি'র লাইসেন্সি। বিইআরসি আইনের ৩৪(৬) উপধারা মতে জ্বালানি তেলের মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব বিপিসিকে বিইআরসি'র নিকট পেশ করতে হবে। উক্ত আইনের ৩৪(৪) উপধারা মতে জ্বালানি তেলের মূল্যহার নির্ধারণের একক এখতিয়ার বিইআরসি'র। উক্ত আইন লঙ্ঘন করে বিপিসি ডিজেল ও কেরোসিন তেলের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব জ্বালানি ও খনিজ

সম্পদ বিভাগে পেশ করে। উক্ত বিভাগ বিইআরসি'কে পাশ কাটিয়ে বিইআরসি আইন লঙ্ঘন করে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করায় ক্যাব উক্ত আইনের ৪৭ ধারা মতে বিইআরসি আইন লঙ্ঘনের দায়ে বিপিসি এবং জ্বালানি বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিচার চেয়েছে। অথচ বিইআরসি নিষ্ক্রিয়।

মূল্যহার নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ, এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিইআরসি প্রতিষ্ঠিত। বিইআরসি আইনের ৩৪(২)(খ), (গ), ও (ঘ) উপধারা মতে মূল্যহার জ্বালানি সরবরাহ ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, দক্ষতা, ন্যূনতম ব্যয়, উত্তম সেবা প্রদান ও উত্তম বিনিয়োগ, এবং ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করা বিইআরসি'র দায়িত্ব। প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(২)(ক)(অ) উপধারা মতে জ্বালানির ক্রয় বা বিক্রয় মূল্য অস্বাভাবিকভাবে নির্ধারণ বাজারে প্রতিযোগিতার পরিপন্থী বলে প্রতিভাত হলেও বিইআরসি নিষ্ক্রিয়।

সরকারি ও পিপিপি কোম্পানিসমূহের পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি এবং বেশ কিছু পরিচালক মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ। এ-সব কোম্পানি বিইআরসি'র লাইসেন্সি। বিইআরসি এ-সব কোম্পানিসমূহের ডাউনস্ট্রিম রেগুলেটর। মন্ত্রণালয় আপস্ট্রিম রেগুলেট এবং বিইআরসি'র সভাপতি ও সদস্যদের নিয়োগ ও মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ওই সব লাইসেন্সিদের প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় মন্ত্রণালয় এখন জ্বালানির মাঠে প্লেয়ার হিসাবে সক্রিয় এবং আপস্ট্রিম রেগুলেটর হিসেবে নিষ্ক্রিয়। ডাউনস্ট্রিম রেগুলেটর হিসেবে বিইআরসি ভোক্তাস্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষায় ব্যর্থ। জ্বালানির বাজারে প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত। ফলে জ্বালানি বাজারে খাতে হয় ওলিগপলি, নয় মনোপলি প্রতিষ্ঠিত। ইউটিলিটিসমূহ চরম সুশাসন সংকটে।

কয়লা ও গ্যাস রপ্তানি বন্ধ করতে মানুষ রাস্তায় নেমেছিল, শত শত কিলোমিটার লংমার্চ করেছিলাম, এমনকি জীবনও দিতে হয়েছিল। অবশেষে রপ্তানি বন্ধ হলেও সে সম্পদ ভোক্তাদের কাজে আসেনি। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোম্পানি ২৫ বছরেও কয়লা উত্তোলনে সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। দেশীয় কোম্পানির শতভাগ সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সরকার স্থলভাগে বিদেশি কোম্পানিকে দিয়ে অধিক ব্যয়ে গ্যাস উত্তোলন করাচ্ছে। নিজস্ব সক্ষমতায় গ্যাস অনুসন্ধানে অনাগ্রহী। আমদানীকৃত কয়লা, জ্বালানি তেল ও এলএনজির বাজার তৈরিতে সরকার অধিক উৎসাহী। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উৎপাদিত গ্রিড বিদ্যুতের বাজার সম্প্রসারণে মনোযোগী হওয়ার কারণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাজার সৃষ্টি গুরুত্ব পায়নি। ব্যক্তিখাতে এলপিজির বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আবাসন ও পরিবহণ খাতে কৃত্রিম গ্যাস জিইয়ে রাখা হয়েছে এবং এ-খাতে গ্যাসের মূল্যহার বেশি বেশি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এলপিজিসহ পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহকারী সরকারি কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন গুরত্ব পায়নি। এই সব পর্যালোচনায় বলা যায়, বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি উন্নয়ন স্বার্থসংঘাতের শিকার। নবায়নযোগ্য জ্বালানি আরো বেশি শিকার। নইলে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়হার সোলার হোম সিস্টেমে ৮০ টাকা এবং মিনি গ্রিডে ৬০ টাকা হতো না।

পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে প্যারিস চুক্তির আওতায় চলমান 'এনার্জি ট্রানজিশনে' বিশ্বব্যাপী কার্বনমুক্ত অর্থনীতি গড়ার আন্দোলন চলছে। তাতে অনবায়নযোগ্য জ্বালানি এখন ট্রানজিশনাল ফুয়েল। এই ট্রানজিশনকালে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাজার দ্রুত সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধ হবে। অনবায়নযোগ্য জ্বালানির বাজার অধিকাংশ দেশেই বিলুপ্ত হবে। সেই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষমতা উন্নয়নের বিকল্প নেই। অথচ নবায়নযোগ্য কিংবা অনবায়নযোগ্য জ্বালানি যা-ই বলা হোক না

কেন, নিজস্ব সক্ষমতায় দেশের জ্বালানি সম্পদ উন্নয়নে মনোযোগ নেই।

বাজার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হওয়ায় জ্বালানি খাতে প্রতিযোগিতা নয়, ওলিগপলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকার উদ্যোক্তা। সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহ মনোপলির শিকার। মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা সরকারের পক্ষে উক্ত কোম্পানিসমূহের মালিক এবং পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরিচালক। ফলে জ্বালানি খাতের আপস্ট্রিম রেগুলেটর হিসেবে মন্ত্রণালয় স্বার্থ-সংঘাতযুক্ত, এবং অকার্যকর। এমন পরিস্থিতিতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের লাইসেন্সিরাই বেশি বেশি লুণ্ঠনমূলক মুনাফা লাভের সুযোগ পাচ্ছে এবং ভোক্তা জ্বালানি অধিকারবঞ্চিত।

চাহিদার তুলনায় স্বল্পতার কারণে জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত ও অনিশ্চিত। মধ্যম আয়ের দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বছরে জনপ্রতি ২ টন ওই (ওয়েল ইক্যুইভেলেন্ট) জ্বালানি খরচ হয়। আমেরিকায় সেখানে খরচ হয় ৮ টন ওই। বাংলাদেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা ছিল ০.৫২ টন ওই। সিটি স্টেট দেশগুলো বিবেচনায় না নিলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১ হাজার জনের অধিক জনবসতির কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঘনবসতির দেশ। এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত সীমিত। চাহিদার তুলনায় জ্বালানি সম্পদও খুব কম। তাই দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে এমন অবস্থা মোটেও অনুকূল নয়। ফলে জ্বালানি অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণে সুষ্ঠু ও সঠিক কৌশলগত পরিকল্পনায় টেকসই জ্বালানিখাত নির্মাণের লক্ষ্যে জ্বালানি রূপান্তর নীতি দরকার।

বাংলাদেশের জাতীয় লক্ষ্য ছিল, ২০২১ সাল নাগাদ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১ হাজার ৩৬ মার্কিন ডলার অর্জন করে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া। এ-লক্ষ্যে বাংলাদেশ অনেক আগেই পৌঁছে যায়। ২০২১ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২ হাজার ২২৭ মার্কিন ডলার। এখন বাংলাদেশের লক্ষ্য, ২০৩১ সাল নাগাদ সে আয় ৪ হাজার ৪৬ ডলারে উন্নীত করে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া। সুষ্ঠু জ্বালানি নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ভোক্তার জ্বালানি অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে এ অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। তার জন্য দরকার চলমান জ্বালানি রূপান্তর নীতি ও কৌশলে পরিবর্তন।

বাংলাদেশ জ্বালানি রূপান্তর নীতি ২০২২

সংজ্ঞা

১ "সংবিধান (Constitution)": গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

২ রূপকল্প (Vision): জ্বালানির ব্যাপারে জাতীয় প্রত্যাশা। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অবৈধ ও এখতিয়ারবহির্ভূত কর্তৃত্ব, রেগুলেটরি সংস্থার নিষ্ক্রিয়তা ও অদক্ষতা, সুশাসন সংকট, এবং উপেক্ষিত জ্বালানি অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণ- বাংলাদেশে জ্বালানি উন্নয়নে বড় বাধা। এ-সব বাধা অপসারণ করে জ্বালানি অধিকার অর্জন ও পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে ভোক্তা আন্দোলন গড়ে তোলায় জাতীয় প্রত্যশা।

৩ "জ্বালানি রূপান্তর (Energy Transition)" : এই নীতিমালায় বর্ণিত রূপকল্প বাস্তবায়নে জ্বালানি খাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা মাফিক নানামূখী পরিবর্তনের পথনকশা;

৪ "জ্বালানি অধিকার (Right to Energy)" : ভোক্তা শ্রেণিভেদে ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যহারে চাহিদা অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি প্রাপ্তির অধিকার;

৫ "স্বত্বাধিকার (Entitlement)" : কোন পণ্য বা সেবার উপর ভোক্তার মালিকানার অধিকার;

৬ "সক্ষমতা (Capability)" : জনস্বার্থে বাঞ্ছনীয় নানা কিছু করতে পারার সমষ্টিগত সামগ্রিক সামর্থ্য;

৭ "জ্বালানি নিরাপত্তা (Energy Security)" : ক্রয় ক্ষমতায় নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি প্রাপ্যতা;

৮ "ভোক্তা (Consumer)" : সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন দলিল অনুযায়ী যে ব্যক্তি তার মালিকানাধীনে লাইসেন্সি কর্তৃক জ্বালানি সরবরাহ পায় বা পেয়েছে;

৯ "জীবনমান (Quality of Living)" : ভোক্তার জীবনযাত্রার ব্যয় ও ক্রয়ক্ষমতা;

১০ "মন্ত্রণালয় (Ministry)" : বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়;

১১ "নিয়ন্ত্রক সংস্থা (Regulatory Body)": জ্বালানির মান, মাপ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান;

১২ "লাইসেন্সি (Licencee)": জ্বালানি অনুসন্ধান/উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহন, বিপণন, বিতরণ, মজুতকরণ ও সরবরাহের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, কোম্পানি বা সংস্থা;

১৩ "কোম্পানি (Company)": কোম্পানি আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং নিবন্ধিত কোন কোম্পানি;

১৪ "জ্বালানি (Energy)": কয়লা, নিউক্লিয়ার এনার্জি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বায়োমাস, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ;

১৫ "প্রাথমিক জ্বালানি (Primary Energy)": কয়লা, নিউক্লিয়ার এনার্জি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বায়োমাস, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ;

১৬ "গ্যাস (Gas)": প্রাকৃতিক গ্যাস, প্রাকৃতিক তরল গ্যাস (NGL), তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG), সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG), সিনথেটিক (synthetic) প্রাকৃতিক গ্যাস বা সাধারণ চাপে ও তাপে গ্যাসীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয় এমন প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ;

১৭ "প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)": প্রাকৃতিকভাবে গ্যাসীয় অবস্থায় প্রাপ্ত হাইড্রোকার্বন বা হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ বা তরল, বাষ্পীভূত বা সংযুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত গ্যাস;

১৮ "এলএনজি (LNG)": পরিবহন এবং মজুদকরণের সুবিধার্থে cryogenic পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের তরল অবস্থা;

১৯ "সিএনজি (CNG)": নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রায় সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস;

২০ "গ্যাস ক্ষেত্র (Gas Field)": কোন নির্ধারিত ভূতাত্ত্বিক গঠন অথবা বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রাকৃতিক গ্যাসাধার অথবা প্রাকৃতিক গ্যাসাধারসমূহের সমষ্টি;

২১ "পাইপ লাইন (Pipeline)": গ্যাস সরবরাহের জন্য অনুমোদিত পাইপ লাইন এবং কমপ্রেসর, যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, মিটার, চাপ নিয়ন্ত্রক, পাম্প, ভাল্ব এবং এসবের পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতি;

২২ "তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG)": আবদ্ধ পাত্রে চাপের সাহায্যে তরলাকারে সংরক্ষিত গ্যাস যা প্রোপেন অথবা বিউটেনের প্রাধান্যসম্পন্ন এবং এদের যে কোন একটি অথবা উভয়ের মিশ্রণ;

২৩ "পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ (Petroleum Product)": প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত তরল কিংবা কঠিন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ এবং পেট্রোলিয়াম উপজাত যেমন লুব্রিকেন্ট ও পেট্রোলিয়াম দ্রাবক (Solvent) তার অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে প্রাকৃতিক গ্যাস তার অন্তর্ভুক্ত হবে না;

২৪ "ক্ষমতা (Capacity)": জ্বালানি অনুসন্ধান/উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহন ও বিতরণের ক্ষমতা;

২৫ "মূল্যহার (Tariff)": জ্বালানি সরবরাহ বা তদ্‌সম্পর্কিত বিশেষ সেবার মূল্যহার;

২৬ "নির্ধারিত (Prescribed)": বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

২৭ "সস্তা (Least Cost)": ন্যূনতম ব্যয়;

২৮ "প্রবিধান (Regulation)": বিইআরসি আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

২৯ "আইন (Law)": কোনো আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতি;

৩০ "মেথডোলজি (Methodology)": বিইআরসি আইনের ধারা ৩৪ এ বর্ণিত এবং উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধানমালার তফসিলে বিধৃত জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণ পদ্ধতি;

৩১ "বিল (Bill)": বিক্রয় মূল্য এবং চার্জসহ বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ, সেবা অথবা কার্য সম্পাদনের বিনিময়ে ধার্য টাকার নিমিত্ত বিবরণ;

৩২ "হুইলিং চার্জ (Wheeling Charge)": সঞ্চালন ব্যবস্থা ব্যবহারের জন্য বিধিবদ্ধ চার্জ;

৩৩ "লুণ্ঠনমূলক মূল্য (Predatory Price)": নির্ধারিত সঠিক মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য;

৩৪ "দুর্নীতি (Corruption)" বিইআরসি আইনের ৪৬ ধারা মতে আমলযোগ্য অপরাধ;

৩৫ "প্রতিযোগিতা (Competition)": অন্যান্য লাইসেন্সির তুলনায় কোন লাইসেন্সির স্বীয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং পণ্য বা সেবার মান উন্নয়নের অভিপ্রায় ও সক্ষমতা;

৩৬ "মনোপলি (Momopoly)": মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোনো অবস্থা;

৩৭ "ওলিগপলি (Oligopoly)": কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো পণ্য বা সেবার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোনো অবস্থা;

৩৮ "জ্বালানি বাজার (Energy Market)": (ক) জ্বালানির বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের ইচ্ছার ভিত্তিতে ভোক্তা কর্তৃক বিনিময়যোগ্য বা পরিবর্তনযোগ্য জ্বালানির বাজার;

এবং (খ) কোন এলাকা সমন্বয়ে গঠিত বাজার যাতে জ্বালানি সরবরাহ বা সংস্থান অথবা জ্বালানি চাহিদার জন্য প্রতিযোগিতার শর্তাবলী অভিন্ন এবং ভোক্তা বা ভোক্তা শ্রেণিভেদে ভিন্ন;

৩৯ "বিপণন (Marketing)": জ্বালানি বাজারজাতকরণ;

৪০ "পিপিপি (Public-Private Partnership)": সরকারি প্রকল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি সংক্রান্ত দুই বা ততোধিক সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

৪১ "সঞ্চালন (Transmision)": অতি উচ্চ ভোল্টেজ বা চাপে বিদ্যুৎ বা গ্যাস পরিবহন;

৪২ "বিতরণ (Distribution)": লো-ভোল্টেজ এর বিতরণ লাইনের মাধ্যমে ভোক্তাদের বাসস্থান বা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহ অথবা প্রাকৃতিক গাস অথবা পেট্রোলিয়াম পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নচাপের পাইপের মাধ্যমে বা অন্য কোন বিতরণ পদ্ধতিতে ভোক্তাদেরকে গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম অথবা সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG) সরবরাহ;

৪৩ "ক্যাপটিভ পাওয়ার (Captive Power)": কোন ভোক্তা নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহৃত ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদিত বিদ্যুৎ;

৪৪ "ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর (Capacity Factor)": একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন প্ল্যান্টের নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ এবং উক্ত সময়ে ওই প্ল্যান্ট পূর্ণ ক্ষমতায় চললে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো তার অনুপাত;

৪৫ "বিদ্যুৎ উৎপাদন (Power Generation)": প্রাথমিক জ্বালানি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরির প্রক্রিয়া;

৪৬ "জনগণ (People)": জন্মসূত্রে বাংলাদেশের অধিবাসী এবং যাদের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৪৭ "রাষ্ট্র (The Republic)": সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং

৪৮ "সরকার (Government)": কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যার কার্যাবলী সংবিধান, আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন দলিলপত্র দ্বারা অর্পিত।

প্রস্তাবনা

সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ মতে, ভূমি ও সাগরের অন্তঃস্থ সকল জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের মালিক প্রজাতন্ত্র। ৭ অনুচ্ছেদ মতে, প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। অতএব, মালিকানার সূত্রে যে-সব সম্পদের ওপর জনগণের অধিকার রয়েছে, জ্বালানি সম্পদের অধিকার তার অন্যতম। ১৩ অনুচ্ছেদ মতে, জ্বালানি উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক হবেন জনগণ। সে–উদ্দেশ্যে রাষ্টায়াত্ত সরকারি খাতসমূহ সৃষ্টি করা হবে এবং জনগণের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে উৎপাদিত জ্বালানি ও জ্বালানিজাত পণ্য রাষ্ট্র কর্তৃক সরবরাহ হবে এবং ১৯ অনুচ্ছেদ মতে বণ্টনে সমতা নিশ্চিত করা হবে। ২১ অনুচ্ছেদ মতে, জ্বালানি তথা জাতীয় সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব সকল নাগরিকের। তাই এ-সম্পদ রক্ষায় প্রয়োজনে যে কোন নাগরিক ১০২ অনুচ্ছেদ মতে সুপ্রিম কোর্টে রিট আবেদন করতে পারবেন। তাছাড়া জ্বালানি নিরাপত্তার অভাবে যদি জীবন বিপন্ন/হুমকির সম্মুখীন হয়, তাহলে সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জীবন রক্ষার মৌলিক অধিকার খর্ব হবে। যেহেতু জ্বালানি ও জ্বালানিজাত পণ্য এবং তার উৎপাদনযন্ত্র, ব্যবস্থাপনা এবং বিতরণ ও বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক জনগণ, সেহেতু জ্বালানি অনুসন্ধান এবং জ্বালানি ও জ্বালানিজাত পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ, বিতরণ ও বণ্টন এবং এ-সবের উন্নয়ন জনগণের কর্তৃত্বে নিশ্চিত হলে সস্তায় ভোক্তার জ্বালানি প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। তাতে জ্বালানির ওপর সাধারণ ভোক্তার স্বত্বাধিকার অর্জন সহজ হয়।

দারিদ্র বিমোচন ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সামর্থ্য বা সক্ষমতা (Capability) থাকা চাই। সক্ষমতা মূলতঃ নির্ভর

করে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির ওপর জনগণের কতখানি স্বত্বাধিকার (Entitlement) আছে, তার ওপর। যদি সে স্বত্বাধিকার প্রকৃতই থেকে থাকে, তাহলে টেকসই জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ফলে মাথাপিছু জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং জ্বালানি প্রবাহ প্রবৃদ্ধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। তাতে জনগণের আর্থিক উন্নতি ও অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। এ-জন্য একটি জাতীয় জ্বালানি নীতি অপরিহার্য।

সরকার ১৯৯৫ সালে জাতীয় জ্বালানি নীতি গ্রহণ করে। ২০০৪ সালে তা সংশোধিত হলেও অনুমোদিত হয়নি। উক্ত জ্বালানি নীতির মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল, জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জ্বালানিখাত উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগ আর্কষণের প্রয়োজনে এ খাতের সংস্কার/রূপান্তর চললেও তা বিভ্রান্তির শিকার হয়। ফলে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তায় অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। জ্বালানি খাত উন্নয়ন ও পরিচালনায় সরকারের নীতিগত অবস্থান সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরিপন্থি বলে প্রতীয়মান হয়।

নিজস্ব মালিকানায় নিজস্ব জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সবচেয়ে সস্তা। এই কৌশল অবলম্বনে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোক্তাদের পক্ষে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) জাতীয় সমন্বিত জ্বালানি নীতি শীর্ষক প্রস্তাবনা ২০১১ সালে তৈরি করে।

চলমান জ্বালানি রূপান্তরে জ্বালানি সরবরাহে ক্রমাগত কার্বনযুক্ত জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ উন্নয়ন অনুল্লেখযোগ্য। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও বাজার সৃষ্টি করা যায়নি। আবার অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে

সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ভর্তুকি এবং ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানির মূল্যহার বৃদ্ধি অব্যাহত। ফলে জ্বালানির ওপর ভোক্তার স্বত্বাধিকার অর্জন করা বা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। সঠিক দামে, মাপে ও মানে জ্বালানি না পাওয়ায় ভোক্তা একদিকে অধিকার বঞ্চিত, অন্যদিকে আয় অপেক্ষা জ্বালানি ব্যয় অধিক হওয়ায় অধিকাংশ ভোক্তার জ্বালানি নিরাপত্তা বিপন্ন। জ্বালানি নিরাপত্তা সুরক্ষা নিশ্চিত না হলে ভোক্তার জীবন রক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা কঠিন। তাছাড়া কার্বন সম্পৃক্ত জ্বালানির ব্যবহার অব্যাহত বৃদ্ধিতে পরিবেশ সুরক্ষায় ঝুঁকি বাড়ছে।

সম্ভাব্য ন্যূনতম মূল্যে মানসম্মত জ্বালানি ব্যবহারের অধিকার সকল ভোক্তার রয়েছে। আইন ও আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে রাষ্ট্র সেই স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করেছে। জ্বালানি খাতে অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা হলে জ্বালানি উৎপাদক, বিক্রেতা ও ক্রেতার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। আবার উন্নত প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হলে জ্বালানি সরবরাহ ব্যয়বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকে। চলমান রূপান্তরে (Transition) জ্বালানি খাতে যে-সব পরিবর্তন বা রূপান্তর (Transformations) আনা হয়েছে, আনা হচ্ছে এবং পরিকল্পনাধীন রয়েছে, সে-সবের কারণে জ্বালানি অনুসন্ধান/উৎপাদন, পরিবহন/সঞ্চালন ও বিতরণে লুণ্ঠনমূলক (Predatory) ব্যয় দ্রুত এবং অত্যধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাতে একদিকে ভোক্তার জ্বালানি অধিকার যেমন বিপন্ন, অন্যদিকে পরিবেশ সুরক্ষার সাথে ভোক্তার জ্বালানি নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ায় ভোক্তার জীবন রক্ষার অধিকারও তেমনই বিপন্ন।

আমরা যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিই, যে জল পান করি, যে জীবাণুমণ্ডলে বাস করি, যে মাটিতে খাদ্যশস্য ফলাই– সে সবই

আমাদের জীবনযাপনের মানকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। জীবনযাপনের যথার্থ বাঞ্ছনীয় সুযোগ অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। পরিবেশের হাল ও স্বাস্থ্য তাদের অন্যতম। পরিবেশ ও উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরিপূরক, সাংঘর্ষিক নয়। তাই সক্ষমতা ও জীবনমান উন্নয়ন পরিবেশ ও ইকোলজি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যায় না। এহেন বিবেচনা এখনও আমাদের নীতি ও পরিকল্পনায় অনুপস্থিত। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আমরা এখনো সক্ষম হইনি।

পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে Paris Agreement-এর আওতায় মূলতঃ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা এবং কম কার্বনযুক্ত টেকসই ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ এবং প্রচেষ্টা বৃদ্ধি ও জোরালো করার তাগিদে বিশ্ববাসী ২০১৫ সালে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের অন্যতম। কিন্তু দুর্নীতি তথা লুণ্ঠনমূলক ব্যয়মুক্ত জ্বালানি ব্যতীত উক্ত চুক্তির আলোকে চলমান জ্বালানি রূপান্তরে বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এই বিবেচনায়, জ্বালানি অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়নে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ প্রস্তাবিত 'জাতীয় সমন্বিত জ্বালানি নীতি, ২০১১'-এর হালনাগাদ খসড়া 'বাংলাদেশের জ্বালানি রূপান্তর নীতি, ২০২২' প্রণয়ন করেছে। ভোক্তা সাধারণের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে খসড়াটি প্রকাশিত হলো।

এই নীতিমালায় প্রস্তাবিত রূপকল্প ও উদ্দেশ্যসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ জ্বালানি অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্ষম ও দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত হবে এবং বৈষম্যহীন উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই নীতিমালা বাংলাদেশ জ্বালানি রূপান্তর নীতি, ২০২২' নামে অভিহিত হবে।

২. নীতিমালার যৌক্তিকতা

সংবিধানে সামাজিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বহুল মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এই 'জ্বালানি রূপান্তর নীতি' কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদে নির্দেশনা রয়েছে ঃ

"১৯(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

এ নীতিমালা সকল পক্ষগণের জন্য একটি পালনীয় নির্দেশিকা। একই সঙ্গে এটি জ্বালানি খাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি ব্যক্তিখাত উন্নয়ন ও তার অবদান অর্থবহ করার ক্ষেত্রে ভোক্তাদের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ উদ্যোগ।

৩. কাঠামো ও অনুসৃত রীতি

একটি রূপকল্প, ১৪টি উদ্দেশ্য ও ১০৪টি কৌশলগত বিষয় নিয়ে এ নীতিমালা পিরামিড আকারে সাজানো হয়েছে এবং পরে কম-বেশি ৪০০টি করণীয় বিষয় যোগ হবে। রূপকল্প ও উদ্দেশ্যকে জাতীয় দর্শন ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে কৌশলগত বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সুফল এ নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জ্বালানি ও আর্থিক খাতসহ সার্বিক উন্নয়নে পাওয়া যাবে। করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য নিম্নের মেয়াদ বিবেচনা করা হয়েছে:

- স্বল্প মেয়াদি (১৮ মাস বা কম)
- মধ্য মেয়াদি (৫ বছর বা কম) এবং
- দীর্ঘ মেয়াদি (২০ বছর বা কম)।

তবে যেসব করণীয় বিষয়াদি বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগতে পারে, সেগুলো একাধিক মেয়াদব্যাপী বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। রূপকল্প, উদ্দেশ্য, কৌশলগত বিষয় ইত্যাদির ব্যাপারে প্রচলিত ধারণা ব্যক্তি এবং ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে ব্যাপকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এই নীতিমালার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে:

উদ্দেশ্য : রূপকল্প অর্জনের জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো লক্ষ্যমাত্রা।

কৌশলগত বিষয় : লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলো করণীয় বিষয়ের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপকভিত্তিক সুপারিশ।

কর্ম-পরিকল্পনা : ওইসব সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কৌশলগত বিষয়ের আওতাভুক্ত কর্মগুচ্ছ পরবর্তীতে প্রণয়ন করা হবে), যার ফলাফল, সময়সীমা এবং বাস্তবায়নকারী সুনির্দিষ্ট।

৪. নীতিমালার স্বত্বাধিকার তদারকি এবং রিভিউ

জাতীয় পর্যায়ে এ-নীতিমালা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন এই নীতিমালার স্বত্বাধিকারী হবেন। সরকারি পর্যায়েও এই স্বত্বাধিকার নিশ্চিত হতে হবে। এই বিবেচনায় এই নীতিমালার নিম্নরূপ স্বত বিবেচনা করা হয়েছে:

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সভাপতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই নীতিমালার তদারকি ও সমন্বয় সাধন করবেন। অন্যদিকে বিইআরসি, প্রতিযোগিতা কমিশন, বিএসটিআই, এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা, ইউটিলিটি এবং সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তা ও ভোক্তা সংগঠনসমূহের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এই নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত হতে করবে। কোনো ব্যত্যয় হলে সে ক্ষেত্রে জাতীয় জ্বালানি টাস্কফোর্স-এর নির্দেশনা গ্রহণ করা হবে। জাতীয় জ্বালানি টাস্কফোর্স এ নীতিমালা বাস্তবায়নে তদারকির ভূমিকায় থাকবে। ক্যাব কর্তৃক জাতীয় জ্বালানি টাস্কফোর্স গঠিত হবে।

নীতিমালায় বর্ণিত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অবস্থা যাচাই ও করণীয় বিষয়সমূহের পরিবর্তন এবং অগ্রাধিকার নিরূপণের জন্য প্রতি বছর করণীয় বিষয়সমূহ (Action Items) পর্যালোচনা করা হবে। নিত্যনতুন পরিবর্তন আঙ্গিকে বিশেষ লক্ষ্যসমূহকে পুনর্নির্ধারণের জন্য নীতিমালার কৌশলগত বিষয়গুলো প্রতি ৩

বছর অন্তর পর্যালোচনা করা হবে। এছাড়া নীতিমালা বাস্তবায়নের সফলতা ও ব্যর্থতার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি করণীয় বিষয়াদির সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে প্রতি ৬ বছর পর পূর্ণ নীতিমালাটি পর্যালোচনা করা হবে।

এই নীতিমালার রূপকল্প ও উদ্দেশ্যসমূহ সফল বাস্তবায়ন করা হলে আগামী প্রজন্মে বাংলাদেশ আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী ও সমৃদ্ধ হবে।

৫. রূপকল্প

২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যহারে পরিবেশবান্ধব নিরবচ্ছিন্ন প্রাথমিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৬. উদ্দেশ্য

উল্লিখিত রূপকল্প বাস্তবায়নে জন্য জ্বালানি রূপান্তরের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্দেশ্যাবলীঃ

৬.১ জ্বালানির ওপর জনগণের মালিকানা ও স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করা

৬.২ জ্বালানি উন্নয়নের সকল পর্যায়ে ন্যায্যতা ও সমতা নিশ্চিত করা

৬.৩ জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা

৬.৪ স্থানীয় প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা

৬.৫ ভোক্তাবান্ধব জ্বালানি মূল্যহার নির্ধারণ নীতি গ্রহণ করা

৬.৬ ভোক্তাবান্ধব জ্বালানি রূপান্তর কৌশল নির্ধারণ করা

৬.৭ রেগুলেটরি ব্যবস্থা উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা

৬.৮ জ্বালানি উন্নয়নে ভোক্তাবান্ধব বিনিয়োগ কৌশল নির্ধারণ করা

৬.৯ জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের দক্ষতা ও ক্ষমতা উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা

৬.১০ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা

৬.১১ জ্বালানি সরবরাহের বিভিন্ন স্তরের নিয়োজিত মানবসম্পদ উন্নয়নকৌশল নির্ধারণ করা

৬.১২ জ্বালানি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা

৬.১৩ পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ এবং পরিবর্তন মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণ করা এবং জ্বালানি উন্নয়নে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষায় আইনি কৌশল নির্ধারণ করা।

৭. কৌশলগত বিষয়বস্তু

৭.১. মালিকানা/স্বত্বাধিকার

৭.১.১. প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ মতে ভূ ও সমুদ্র গর্ভের জ্বালানি সম্পদের মালিক জনগণ বিধায় এ সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১.২. অনুচ্ছেদ ১৩ মতে, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন যন্ত্র এবং উৎপাদিত পণ্য বণ্টন ও বিতরণের মালিক বা নিয়ন্ত্রক জনগণ বিধায় জ্বালানি ও জ্বালানিজাত পণ্য যথা সার, সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদির ওপর জনগণের মালিকানা বা স্বত্বাধিকার নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১.৩. অনুচ্ছেদ ১৬ মতে শহর ও পল্লী অঞ্চালের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, পল্লী বিদ্যুতায়ন, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধিত হতে হবে।

৭.১.৪. অনুচ্ছেদ ১৮(১) মতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ইকো-সিস্টেমের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১.৫. অনুচ্ছেদ ৭ মতে, প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ তথা ভোক্তা সাধারণ এবং জনগণের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। ফলে উল্লিখিত অভিব্যক্তিগুলির প্রতিফলন চলমান জ্বালানি রূপান্তরে নিশ্চিত হতে হবে।

৭.২. ন্যায্যতা, সমতা ও স্বচ্ছতা

৭.২.১. জ্বালানি উৎপাদন, বিতরণ ও বণ্টনে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি ইউটিলিটির পরিচালনা নীতি ও কৌশল সমতাভিত্তিক হতে হবে।

৭.২.২. ভোক্তা যেন ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যে মানসম্মত জ্বালানি সেবা পায়, সেজন্য উৎপাদন, সঞ্চালন, বণ্টন ও বিপণনসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.২.৩. জ্বালানি সম্পদ ব্যবহারে সর্বস্তরের মানুষের জন্য সুষম সুযোগ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.২.৪. ভোক্তার জ্বালানি অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণ চলমান জ্বালানি রূপান্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে হবে।

৭.২.৫. জ্বালানি বঞ্চিত প্রান্তিক জনগণের জীবনমান উন্নয়নে জ্বালানির ওপর তাদের স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৩. জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল

৭.৩.১. অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদা নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৩.২. বিদ্যুৎ আমদানি ক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনায় রিজার্ভ মার্জিন নির্ধারিত হতে হবে।

৭.৩.৩. মেয়াদ উত্তীর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ ক্রয় মূল্য স্থির ব্যয়বহির্ভূত হতে হবে এবং মূল্য বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে।

৭.৩.৪. দেশি-বিদেশি এবং সরকারি-বেসরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহে বৈষম্য নিরসন হতে হবে।

৭.৩.৫. সকল সেবা ও পণ্য উৎপাদনে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক ও আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ক্যাপটিভ/বিকল্প বিদ্যুৎ হিসাবে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৩.৬. রপ্তানিমুখী বিদেশি মালিকানাধীন সার, সিমেন্ট এবং ইস্পাত কারখানায় বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত বাণিজ্যিক মূল্যহারে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৩.৭. স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনায় পরিবহণে জ্বালানি হিসেবে তৈল, সিএনজি ও এলপিজির স্থলে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি নিশ্চিত হতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বিদ্যুতের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৩.৮. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় রিক্সা, ভ্যান, অটোরিক্সা, মটর সাইকেল- এমন সব গ্রামীণ পরিবহনে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৩.৯. মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনায় চাষে ডিজেলের পরিবর্তে এবং সেচে ডিজেল ও গ্রিড বিদ্যুতের পরিবর্তে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনায় সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৩.১০. গ্রিড বিদ্যুৎ সরবরাহ অলাভজনক এমন অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত হতে হবে এবং মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় ওইসব অঞ্চল শতভাগ অফ-গ্রিড নবায়নযোগ্য বিদ্যুতে বিদ্যুতায়ন হতে হবে।

৭.৩.১১. মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনায় গ্রিড বিদ্যুতের পরিবর্তে সৌর বিদ্যুতে আইপিএস চার্জ শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৩.১২. ক্রমাগতভাবে পৌর এলাকায় স্ট্রিট লাইটিং-এ সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি হতে হবে।

৭.৩.১৩. প্রাথমিক জ্বালানি মিশ্রে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনায় কয়লা ও জ্বালানি তেলের অনুপাত কমাতে হবে। নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান ও মজুদ বৃদ্ধি দ্বারা জ্বালানি আমদানি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৩.১৪. মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনায় প্রথাগত বায়োমাস জ্বালানি উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত ও বাস্তবায়িত হতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে বায়োমাস জ্বালানির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে।

৭.৩.১৫. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় চলমান জ্বালানি রূপান্তর প্যারিস চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং জ্বালানি উন্নয়নের মাধ্যমে জ্বালানি বিপ্লবের বিকাশ হতে হবে।

৭.৩.১৬. ন্যূনতম ব্যয়ে এবং সর্বোচ্চ দক্ষতায় জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা হতে হবে।

৭.৪. স্থানীয় প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে জাতীয় সক্ষমতা উন্নয়ন কৌশল

৭.৪.১. নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে আর্থিক অনুদান ও প্রণোদনা থাকতে হবে।

৭.৪.২. জ্বালানি মূল্য নির্ধারণ কৌশলে স্থানীয় প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালনির বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিশেষভাবে প্রাধান্য থাকতে হবে।

৭.৪.৩. ন্যূনতম ব্যয়ে এবং সর্বোচ্চ দক্ষতায় জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন গবেষনা হতে হবে।

৭.৪.৪. মন্ত্রণালয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

৭.৫. মূল্যহার নির্ধারণ কৌশল

৭.৫.১. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণ বিদ্যমান পদ্ধতি তথা প্রবিধানমালা সংশোধন হতে হবে।

৭.৫.২. সরকারি ও ব্যক্তিখাতভিত্তিক জ্বালানির বাল্ক মূল্যহার নির্ধারণ প্রবিধান দ্বারা বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি হতে হবে।

৭.৫.৩. বিদ্যমান মূল্যহার বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রান্তিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভোক্তার জ্বালানি সেবার বিদ্যমান মূল্যহার পদ্ধতি রিভিউ হতে হবে।

৭.৫.৪. বাণিজ্য ও শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে কস্ট প্লাস নীতির ভিত্তিতে মূল্যহার নির্ধারিত হতে হবে। তবে তাদের ক্ষেত্রে যেসব আর্থিক প্রণোদনা রয়েছে, সেসব প্রণোদনা বিদেশি কোম্পানির প্রাপ্ত প্রণোদনার সাথে যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৫.৫. দেশি শিল্প ও রপ্তানিমুখী বিদেশি শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাসের মান ও মূল্যহারে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন হতে হবে।

৭.৫.৬. বাণিজ্যিক ও এসি আবাসিক গ্রাহকসহ বিভিন্ন বিনোদন এবং বিলাসী জীবন যাপনে ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্য বাণিজ্যিক মূল্যহারে নির্ধারিত হতে হবে।

৭.৫.৭. গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত যানবাহনে ব্যবহৃত জ্বালানির নির্ধারিত মূল্য পৃথক হতে হবে।

৭.৫.৮. প্রান্তিক ভোক্তার ক্ষেত্রে রান্নায় ব্যবহৃত এলপিজি ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বিদ্যুতের অনুরূপ ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৭.৬. জ্বালানি রূপান্তর কৌশল

৭.৬.১. রূপান্তর কার্যক্রম যেন ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ ও প্যারিস চুক্তিসম্মত হয়, সেজন্য চলমান রূপান্তর কার্যক্রমের মূল্যয়ন হতে হবে।

৭.৬.২. কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ খাতকে জ্বালানি রূপান্তর কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে।

৭.৬.৩. জ্বালানি খাতের ইউলিটিসমূহের বেতন-ভাতা ও পদোন্নতি এবং মুনাফা মার্জিন দক্ষতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৬.৪. জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহ শতভাগ জনগণের মালিকানায় নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৬.৫. পিপিপি পলিসি'র আওতায় জ্বালানি উন্নয়ন রহিত হতে হবে।

৭.৬.৬. সরকারি মালিকানাধীন এনার্জি ইউটিলিটির শেয়ার ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর নিষিদ্ধ হতে হবে। শতভাগ মালিকানা জনগণের নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৬.৭. সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা জ্বালানি খাতকে লেভেল প্লেইং ফিল্ড-এ পরিণত করতে হবে।

৭.৬.৮. জ্বালানি সেবা স্বার্থসংঘাত মুক্ত হতে হবে।

৭.৭. রেগুলেটরি উন্নয়ন কৌশল

৭.৭.১. কয়লা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বায়োমাস রেগুলেটরি সিস্টেমের আওতাভূক্ত হতে হবে।

৭.৭.২. সরকারি ও ব্যক্তি উভয় খাতে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান ও উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি আমদানি রেগুলেটরি সিস্টেমের আওতাভূক্ত হতে হবে।

৭.৭.৩. রেগুলেটরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি এবং আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ণে অংশীজনদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন আইন দ্বারা বলবৎ যোগ্য হতে হবে।

৭.৭.৪. সরকারি খাতের পাশাপাশি ব্যক্তিখাতকেও রেগুলেটরি সিস্টেমের আওতাভূক্ত হতে হবে।

৭.৭.৫. আপস্ট্রিম রেগুলেটর হিসাবে মন্ত্রণালয়কে শুধুমাত্র নীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং আইন, বিধি ও রেগুলেটরি আদেশসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নজরদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

৭.৭.৬. কারিগরি পেশাদার নিজস্ব জনবল দ্বারা স্বাধীনভাবে সংস্থাসমূহের পরিচালনা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৭.৭. রেগুলেটরি সংস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৮. বিনিয়োগ কৌশল

৭.৮.১. সরকারের অধীনে জ্বালানি উন্নয়নে ব্যক্তিখাত বিনিয়োগ এবং সম্পৃক্ততা উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত হবে পারে, তবে মালিকানার বিনিময়ে নয়।

৭.৮.২. গ্যাস উন্নয়ন তহবিল জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল, ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ জ্বালানি অনুসন্ধান/উৎপাদন/আমদানিতে অনুদান হিসেবে ইকুইটি বিনিয়োগ হতে হবে।

৭.৮.৩. জ্বালানি উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহণ এবং বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে স্ব-স্ব সেগমেন্টে বিনিয়োগের মধ্যে সমন্বয় ও সমতা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৮.৪. সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের প্রকার ও প্রকৃতি পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে।

৭.৮.৫. স্থলভাগের গ্যাসক্ষেত্রের শতভাগ উন্নয়ন কেবলমাত্র দেশীয় কোম্পানি দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৮.৬. সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ, সার, সিমেন্ট ও ইস্পাত উৎপাদনে প্রদত্ত গ্যাসের অনুপাতসমূহ এবং আয় ও বিনিয়োগের অনুপাতসমূহ নির্ধারিত হতে হবে।

৭.৮.৭. জ্বালানি উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ হ্রাস ও ব্যক্তি খাত বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে জ্বালানি সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি অপটিমাইজড হতে হবে।

৭.৮.৮. কার্বণ নিঃসরণ ও উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহে উৎসভিত্তিক জ্বালানিসমূহের অনুপাত নির্ধারণ হতে হবে ।

৭.৮.৯. সাগরের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ উন্নয়নে দেশীয় কোম্পানির সরাসরি অংশগ্রহণ এবং সক্ষমতা উন্নয়ন নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৮.১০. গ্যাস উন্নয়ন তহবিল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল ও জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং ব্যবস্থাপনায় ভোক্তার অংশগ্রহণ ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৮.১১. পিএসসি'র আওতায় তেল/গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর ভাগের সমুদয় তেল/ গ্যাস সরকারের জন্য ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হতে হবে।

৭.৮.১২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৮.১৩. বাণিজ্যিক ঋণে বিওওটি বেসিসে জ্বালানিখাত উন্নয়ন রহিত হতে হবে।

৭.৮.১৪. জ্বালানি খাতে সরকার ব্যক্তিখাতের সাথে যৌথ মালিকানায় কোনোভাবেই ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত হবে না এবং সরকারি মালিকানাধীন কোনো কোম্পানির শেয়ার ব্যাক্তিখাতে হস্তান্তর হবে না, নিশ্চিত হতে হবে।

৭.৯. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন কৌশল

৭.৯.১. তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত দেশীয় তিনটি কোম্পানি একীভূত হয়ে একটি জাতীয় কোম্পানি গঠিত হতে হবে।

৭.৯.২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে পেট্রোবাংলা/বিপিডিবির অনুরূপ স্রেডাকে স্ব-শাসিতসংস্থায় পরিণত হতে হবে। এ-খাত উন্নয়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সক্ষম উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ থাকতে হবে।

৭.৯.৩. বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থা বিভাজন করে সরকারি মালিকানাধীনে পিডিবি'র আওতায় গ্যাসখাতের অনুরূপ ইউটিলিটি কোম্পানি গঠন/পূণর্গঠন সম্পন্ন হতে হবে।

৭.৯.৪. জ্বালানি তেল, গ্যাস, কয়লা ও বিদ্যুৎখাতের কোম্পানিসমূহের পরিচালনার ব্যাপারে স্ব স্ব পরিচালনা বোর্ড মন্ত্রণালয় কিংবা নিয়ন্ত্রক সংস্থার (বিপিসি, পেট্রোবাংলা, অথবা বিপিডিবি) নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে।

৭.৯.৫. হাইড্রো-কার্বন ইউনিট, পাওয়ার সেল এবং পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটকে স্ব স্ব সংস্থায় একীভূত হয়ে জ্বালানি উন্নয়নে গবেষণা ও পরিকল্পনায় সক্ষম ও ক্ষমতায়নকৃত হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্থা, সরকার এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের গবেষণা, পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনে তাদেরকে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। ইপিআরসি আমলামুক্ত ও গবেষকদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে হবে।

৭.৯.৬. নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মন্ত্রী পরিষদ ও পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা অধিকতর অর্থবহ হতে হবে।

৭.৯.৭. সকল প্রকার ক্রয় প্রক্রিয়ায় ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী কর্তৃত্ব রহিত হতে হবে।

৭.৯.৮. সংস্থাসমূহের সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ বিইআরসি কর্তৃক এবং এর জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি স্বার্থ সংঘাতমুক্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারা হতে হবে।

৭.৯.৯. জাতীয় জ্বালানি টাস্কফোর্স নাগরিকদের পক্ষে নজরদারির ভূমিকায় থাকবে।

৭.১০ জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল

৭.১০.১ জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবহারে জ্বালানি সাশ্রয়ী কৌশলসমূহ আইন দ্বারা বলবৎ যোগ্য হতে হবে।

৭.১০.২. জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার আইন ও প্রয়োজনে প্রণোদনা দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১০.৩. জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আর্থিক প্রণোদনাসহ গৃহীত নানাবিধ কৌশল আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হতে হবে।

৭.১১. মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল

৭.১১.১ জ্বালানি খাতে কারিগরি দক্ষ জনবলের ঘাটতি পূরণের জন্য দক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রণোদনা ও পদোন্নতির বিধান থাকতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১১.২. পেশাগত দক্ষতা যাচাই ও উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া থাকতে হবে।

৭.১১.৩. ভোক্তা, ইউটিলিটি, রেগুলেটরি, পলিসি ও পরিকল্পনা পর্যায়ে জ্বালানি রূপান্তরের প্রভাবে ওপর নিয়মিত গবেষণা ও অনুশীলন হতে হবে।

৭.১১.৪. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জ্বালানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। এ ব্যাপারে ক্যাব ও ইপিআরসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭.১১.৫. প্রশিক্ষণের ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীকে বিদেশে পাঠানোর পরিবর্তে বিদেশি বিশেষায়িত প্রশিক্ষকের দ্বারা দেশে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১১.৬. শিল্প, কারখানা ও বিভিন্ন সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট/কেন্দ্রসমূহকে জ্বালানি রূপান্তর কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন হতে হবে। এ-সব প্রতিষ্ঠান ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনে শিল্প খাতে আবশ্যকীয় জনবল তৈরিতে সহায়ক হবে। এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক কোর্সের জন্য আউট-সোর্সিং হিসেবে ব্যবহার হতে হবে এবং সম্পদের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১১.৭. সকল পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে জ্বালানি অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৭.১১.৮. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উক্ত বিষয়ভিত্তিক একটি সার্বজনীন কোর্স চালু হতে হবে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উন্নয়ন জ্বালানি রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে হবে।

৭.১১.৯. বিশেষায়িত উচ্চ জ্বালানি শিক্ষায় শিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়ন নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখতে হবে।

৭.১১.১০. কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় জ্বালানি অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক কোর্স ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৭.১২. পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

৭.১২.১. রূপকল্প বিবেচনায় রেখে জ্বালানি খাতের বিদ্যমান প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রিভিউ হতে হবে। প্রস্তাবিত এই জ্বালানি রূপান্তর নীতির ভিত্তিতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করতে হবে।

৭.১২.২. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় কৃষির অনুরূপ জ্বালানিতেও সরকারি বিনিয়োগ মূখ্য হতে হবে।

৭.১২.৩. জ্বালানি খাত উন্নয়ন বাজেটে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৭.১২.৪. অনুসন্ধান/উৎপাদন, সঞ্চালন/পরিবহন, বিতরণ ক্ষমতা উন্নয়ন পরিকল্পনা, চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে হতে হবে। বাজেটে বরাদ্দও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৭.১২.৫. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তিন মাস অন্তর অন্তর ভোক্তা সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হতে হবে। জ্বালানি টাস্কফোর্স পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে দেবে।

৭.১২.৬. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও প্যারিস চুক্তির সাথে জ্বালানি রূপান্তর সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং সে লক্ষ্যে সকল আইন, বিধি-বিধান এবং নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা আমূল পরিবর্তন হতে হবে।

৭.১৩ পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ কৌশল

৭.১৩.১. জ্বালানি উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১৩.২. সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার হিসেবে রাষ্ট্র জীবন রক্ষার যে নিশ্চয়তা দিয়েছে, জ্বালানি খাত উন্নয়নে পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতির কারণে সে অধিকার যেন খর্ব/ক্ষুণ্ন না হয়, তা নিশ্চিত হতে হবে এবং ১৮(১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ ও ইকো-সিস্টেম সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, তা নিশ্চিতকরণে শিক্ষার্থী ও ভোক্তা সাধারণের সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৭.১৩.৩. কার্বনমুক্ত অর্থনীতি ও ভোক্তার জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম গ্রিন সোসাইটি বিনির্মাণে ক্যাবের সক্ষমতার উন্নয়ন হতে হবে।

৭.১৩.৪. এ প্রশ্নে আইন, বাণিজ্য, ও জ্বালানি অধিকার ও রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্যমূলক কৌশলগত সম্পর্ক নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১৩.৫. জ্বালানিখাত পরিচালনায় নির্গত বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন প্রশমন করার কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত হতে হবে।

৭.১৩.৬. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানামুখী ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের বিবরণ সমৃদ্ধ ডাটাবেজ থাকতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ হতে হবে।

৭.১৩.৭. জলবায়ু তহবিলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উৎস থেকে উক্ত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ঋণ হিসেবে নয়, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি/আদায় নিশ্চিত হতে হবে এবং সে ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্তদের সক্ষমতা উন্নয়নে বিনিয়োগ আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.১৩.৮. পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব প্রশমন কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে

দেশের ভিতর ও বাইরে থেকে যেসব অর্থায়ন হয়, সেসব কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও তার ফলাফল জ্বালানি অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণে জাতীয়ভাবে কাজে লাগাতে হবে।

৭.১৪. আইনি কৌশল

৭.১৪.১. জ্বালানিখাত পরিচালনা ও উন্নয়নে এযাবৎকাল যেসব নীতি, আইন, বিধি ও বিধান প্রণীত হয়েছে, তা ভোক্তার জ্বালানি অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন হতে হবে।

৭.১৪.২. জ্বালানি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ জ্বালানি অধিকার বিরোধী কি না তা খতিয়ে দেখে সে সম্পর্কে ভোক্তাগণকে অবহিত করার জন্য প্রকাশ করতে হবে।

৭.১৪.৩. জ্বালানি উন্নয়নে সম্পাদিত চুক্তি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে নির্ধারিত মডেল চুক্তি থাকতে হবে।

৭.১৪.৪. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানিখাতে আর্থিকভাবে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সব নাগরিকদের সমন্বয়ে ক্যাব কর্তৃক জাতীয় জ্বালানি টাস্কফোর্স গঠিত হতে হবে।

৮. কর্মপরিকল্পনা ও অর্থায়ন

কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করণীয় বিষয়গুলো জ্বালানি নীতিমালার বাস্তব রূপ, যা পরিশেষে নীতিমালার সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিমাপ করবে। কর্মপরিকল্পনায় প্রায় ৪০০টি করণীয় বিষয় সন্নিবেশিত হবে। তারপরও তা অসম্পূর্ণ থাকবে। কিছু করণীয় বিষয় তারকা চিহ্নিত করে একই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বর্ণিত অন্য করণীয় বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কৌশলগত বিষয়গুলোই কর্মপরিকল্পনা চালিত করবে। মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে করণীয় বিষয়গুলোতে প্রথমে সাধারণভাবে একত্রিত করা হবে। তারপর সেগুলোকে কৌশলগত বিষয় অনুযায়ী ভাগ করা হবে। সব উদ্দেশ্য ও করণীয় বিষয়সমূহ সারণিতে ধারাবাহিকভাবে সাজানো হবে।

প্রতিটি করণীয় বিষয়ের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বাস্তবায়নকাল দেখানো হবে। সেখানে স্বল্প মেয়াদি বলতে ১৮ মাস বা তার কম সময়, মধ্য মেয়াদি বলতে ১৮ মাসের অধিক কিন্তু ৫ বছরের কম এবং দীর্ঘ মেয়াদি বলতে ৫ বছর থেকে অনধিক ২০ বছর সময় বোঝানো হয়েছে। জ্বালানি পরিবর্তনশীল একটি খাত। আগামীতে এ খাতের সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা অর্জন যথেষ্ট বিচার বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। স্বল্প মেয়াদি করণীয় বিষয়গুলো বর্তমান চাহিদা মাফিক নিরূপণ করা হবে। অন্যদিকে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবতা ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর নতুনভাবে বিবেচনা করার দরকার হবে।

করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবায়নের নিমিত্তে জাতীয় বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া এ ব্যাপারে আলাদা তহবিল গঠন আবশ্যক।

সংযুক্তি ১

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইন
ও
বিইআরসি'র ভূমিকা পর্যালোচনা

বাংলাদেশ
জ্বালানি
রূপান্তর
নীতি
২০২২

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইন ও বিইআরসি'র ভূমিকা পর্যালোচনা

ভূমিকা

জ্বালানিতে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ-উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের সঞ্চালন, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা; অপারেশন ও মূল্যহার নির্ধারণ করা, ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের মাধ্যমে জ্বালানি খাতে একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বিইআরসি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষমতা বিইআরসি'র উপর ন্যস্ত। বিইআরসি নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে সীমিত পরিসরে তার ভূমিকা পালন করে। উক্ত আইন মতে কেউ যদি বিইআরসি আইন, বিধি বা প্রবিধানের কোনো বিধান লঙ্ঘন

করে অথবা বিইআরসি'র কোনো আদেশ লঙ্ঘন করে, তাহলে বিইআরসি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কিন্তু কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) তার নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছে যে, বিইআরসি নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিশ্চিতকরণ বা বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির ন্যায্য ও যৌক্তিক মূল্যহার নির্ধারণে ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ। আবার এলপিজি'র নির্ধারিত মূল্যহার বাস্তবায়নেও ব্যর্থ। পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যহার নির্ধারণের এখতিয়ার বিইআরসির হলেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি বিভাগ সে-মূল্যহার বেআইনিভাবে নির্ধারণ করে। বিইআরসি আইন লঙ্ঘনের মতো এমন অপরাধের প্রতিকার ও প্রতিরোধে বিইআরসি ব্যর্থ। আবার বিইআরসি'র জবাবদিহিতা না থাকাও ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় একটি বড় সমস্যা। বিইআরসি ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা উক্ত আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বড় বাধা। ক্যাব ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষায় বিইআরসি'কে শক্তিশালী করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিইআরসি'র ব্যর্থতার মূল কারণ খুঁজে বের করার জন্য ক্যাবের অনুশীলন এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে এ-প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিইআরসি আইনের সম্ভাবনার দিকগুলো সম্যকভাবে বুঝতে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, তুরস্ক, ব্রাজিল এবং ভুটানের সংশ্লিষ্ট আইনের একই ধরনের ধারাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ
জ্বালানি
রূপান্তর
নীতি
২০২২

পর্যালোচনা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইনের বিভিন্ন ধারা ও উপধারা

৭(১)
কমিশনের সদস্য বা চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা/উপযুক্ততার প্রয়োজনীয়তা প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়।

অধিকতর কার্যকর কমিশন গঠনের জন্য আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও উপযুক্ততা বিশেষভাবে পূরণ হতে হবে।

৭(২-৪)
নীতিহীন ও অবিবেচনাপ্রসূত মানসিকতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনের সদস্য বা চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না। উদাহরণস্বরূপ, মালয়েশিয়ার এনার্জি কমিশন আইন ২০০১-এর উপধারা ১০(বি)(ই)।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের জন্য বিইআরসি'র সদস্য/চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থসংঘাত মুক্ত হবেন।

৮(১)
যেহেতু মন্ত্রণালয় প্রায়শই জ্বালানি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্তৃত্বপ্রবণ ভূমিকা পালন করে, সেহেতু বিইআরসি'র চেয়ারম্যান বা সদস্যদের নিয়োগ বা পুনর্নিয়োগে সমঝোতা হতে পারে। ফলে এই নিয়োগ স্বার্থসংঘাতযুক্ত।

শুধু তাই নয়, যখন বিইআরসি ও লাইসেন্সি উভয়ই মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং নিজেও লাইসেন্সি, তখন বিইআরসি'র স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা মারাত্মকভাবে আপসের শিকার। ফলে উপেক্ষিত থাকে ভোক্তা স্বার্থ ও অধিকার। বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত অতীতের মূল্যহার এবং গণশুনানি তারই প্রমাণ।

একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন নিশ্চিত করার জন্য, কমিশনের সামগ্রিক গঠন পদ্ধতি পুনর্বিন্যস্ত হতে হবে, এবং লাইসেন্সির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী ক্ষমতা কমিশনের দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে. যেন ভোক্তাস্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

১১(২)
"কমিশনের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ বা যদি কমিশন "নিজেকে এমনভাবে পরিচালনা করে বা তার অবস্থানের অপব্যবহার করে, যা এই আইনের উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষতিকর বা জনস্বার্থকে বাধাগ্রস্ত করে"- এমন সব শর্তাবলী আইনে স্পষ্টভাবে বিবৃত নয়। আদালত থেকেও কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

বলা হয়, বিইআরসি'র সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত ক্ষতিকারক কার্যকলাপের অনেকগুলি উদাহরণ রয়েছে। তার কিছু সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সদস্য অপসারণ হননি বা সতর্ক করা হয়নি।

বিইআরসি সদস্যদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হতে হবে। এই আইনে অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাতে কমিশন এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে যোগাযোগের সেতু স্থাপন করা যায়।

সদস্যদের অপসারণ পদ্ধতি অস্পষ্ট বলে মনে হয়, মধ্যবর্তী প্রক্রিয়াগুলির আরও স্পষ্টীকরণ এবং বিশদ বিবরণসহ থাকা দরকার।

বিইআরসি'র চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিজ নিজ নিয়োগের আগে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাও গুরুত্বপূর্ণ। মালয়েশিয়ার এনার্জি কমিশন অ্যাক্ট ২০০১-এর ১১ ধারায় এই ধরনের আইনি বিধান পাওয়া যায়।

"ধারা ১১।- কমিশনের সদস্যদের দ্বারা সংবিধিবদ্ধ ঘোষণা:

(১) কোন ব্যক্তিকে কমিশনের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা যাইবে না যদি না এই নিয়োগের পূর্বে তিনি একটি সংবিধিবদ্ধ ঘোষণা না দেন যে, জ্বালানি সরবরাহ কার্যক্রমের সাথে জড়িত কোনো উদ্যোগে তার কোন আর্থিক স্বার্থ, বা অন্য কিছু ছিল কি না।

(২) যদি কমিশনের কোনো সদস্য জ্বালানি সরবরাহ কার্যক্রমের সাথে জড়িত কোনো উদ্যোগে কোনো আর্থিক স্বার্থ, বা অন্যকিছুতে সংশ্লিষ্ট হন, তাহলে তিনি এক মাসের মধ্যে অর্জিত স্বার্থ উল্লেখ করে মন্ত্রীকে লিখিতভাবে নোটিশ দেবেন এবং মন্ত্রী, বিষয়টি বিবেচনান্তে সংগত মনে হলে, উক্ত ব্যক্তি তাঁর অফিস ত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা দেবেন।

১৪

কমিশন গঠনের জন্য উল্লিখিত আইনগত বিধানটি তার স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আরও বিস্তৃত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মালয়েশিয়ার এনার্জি কমিশন অ্যাক্ট ২০০১-এর ধারা ১২ নিম্নরূপে পঠিত:

ধারা ১২।- কমিশন কমিটি গঠন করতে পারে

১. জ্বালানি সরবরাহ আইনসমূহের অধীনে তার কার্য সম্পাদনে সহায়তা করার জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বিবেচনা করে যে কোনো কমিটি গঠন করতে পারে।

২. কমিশন তার সদস্যদের মধ্যে যে কোনো সদস্যকে কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতে পারবে।

৩. কমিশন যে কোনো ব্যক্তিকে কমিটিতে নিয়োগ দিতে পারে।

৪. কমিটির যে কোনো সদস্যকে পুনঃনিযুক্তির জন্য যোগ্য হতে হবে। তিনি নিয়োগ পত্রে উল্লিখিত মেয়াদের জন্য সংশ্লিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৫. কোনো কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকে কমিশন কমিটির যে কোনো সদস্যের নিয়োগ প্রত্যাহার করতে পারে।

৬. কমিটির কোনো সদস্য যে কোনো সময় কমিটির চেয়ারম্যানকে লিখিত নোটিশ প্রদান করে পদত্যাগ করতে পারেন।

৭. কমিশন, যে কোন সময়, কোন কমিটি ভেঙে দিতে পারে বা পরিবর্তন করতে পারে।

৮. কোনো কমিটি তার নিজস্ব কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৯. কোনো কমিটি কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো নির্দেশের অধীনে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে।

১০. কোনো কমিটির সভা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

১১. কোনো কমিটি আলোচনাধীন যে কোনো বিষয়ে পরামর্শের জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি সভায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

১২. কোনো কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং উপধারার অধীনে আমন্ত্রিত কোনো ব্যক্তি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এমন ভাতা এবং অন্যান্য খরচ প্রাপ্য হবেন।

২২

এনার্জি নীতির বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে বিইআরসি কোনো ভূমিকা পালন করে না, যেমনটি মালয়েশিয়ার এনার্জি কমিশন অ্যাক্ট ২০০১-এর ক্ষেত্রে রয়েছে।

আইনের বিধান অনুযায়ী করণীয় বেশিরভাগ কার্য সম্পাদনে বিইআরসি কার্যকর নয়। উদাহরণস্বরূপ, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা, প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিশ্চিত করা, সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সালিশ বা বাজারে একচেটিয়া রোধ করা– এগুলির কোনোটিই বিইআরসি করে না।

বিইআরসিকে আরও কার্যকরভাবে কাজ করা দরকার এবং জনগণের জ্বালানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সরকারকে সময়মত পরামর্শও দেয়া দরকার। বিইআরসি যদি বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতো এবং জ্বালানির দক্ষতা বাড়াতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতো, তাহলে সামগ্রিক জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জন করা যেতো এবং ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত হতো।

ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা প্রতিরোধ বা একচেটিয়াত্বের ব্যাপারে উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করতে বিইআরসি কার্যকর হয়নি।

আরও কতিপয় কাজ রয়েছে, যা বিইআরসি'র কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমন,

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার এবং অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংরক্ষণ বাড়ানো। উদাহরণস্বরূপ, তুরস্কের নবায়নযোগ্য জ্বালানি আইন ২০০৫; মালয়েশিয়ার জ্বালানি কমিশন আইন ২০০১, ইত্যাদি।

সমস্ত ধরণের জ্বালানি সম্পর্কিত নতুন কৌশলগুলিতে গবেষণা, বিকাশ এবং ব্যবহারকে উৎসাহিত করা। উদাহরণস্বরূপ, মালয়েশিয়ার এনার্জি কমিশন অ্যাক্ট ২০০১।

জ্বালানি আইনসমূহ পর্যালোচনা করা এবং সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা। উদাহরণস্বরূপ, মালয়েশিয়ার এনার্জি কমিশন অ্যাক্ট ২০০১।

জ্বালানি সংরক্ষণ নীতি প্রণয়ন করা। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের জ্বালানি সংরক্ষণ আইন ২০০১, সিঙ্গাপুরের জ্বালানি সংরক্ষণ আইন ২০১৩ ইত্যাদি।

এনার্জি ট্রেডিং পলিসি তৈরি করা। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের বিদ্যুৎ আইন ২০০৩, তুরস্কের বিদ্যুৎ বাজার আইন ২০১৩ ইত্যাদি।

জ্বালানি নিলাম নীতি তৈরি করা. উদাহরণস্বরূপ, আইন নং ৮,৯৮৭/১৯৯৫ (রেয়াত আইন) এবং আইন নং ৯,০৭৪/১৯৯৫ (ব্রাজিলের বিদ্যুৎ রেয়াত আইন)।

২৩(১-৮)
তদন্ত এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা এবং স্বার্থের সংঘাতের কারণে বিইআরসি কখনোই সেই ক্ষমতা ব্যবহার করেনি।

একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হলো, এনার্জির মূল্যহার নিয়ন্ত্রণে প্রকৃত প্রেক্ষিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

২৪(১-৩)
বিইআরসি আইন বিইআরসিকে ক্ষমতায়নের পরিবর্তে সরকারকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করে। বলতেই হয় যে, যখন একটি সংবিধিবদ্ধ কমিশন স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় তখন জ্বালানি বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করা উচিত ছিল। কিন্তু স্বার্থ সংঘাত ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে জ্বালানি খাত নিয়ন্ত্রণে এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে সরকার ক্ষমতা ধরে রেখেছে।

মালয়েশিয়ার এনার্জি কমিশন অ্যাক্ট ২০০১-এর অনুরূপ এনার্জি নীতির বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেবার ব্যাপারে বিইআরসি-এর কোনো ভূমিকা নেই। এই ধরনের ক্ষমতা বিইআরসিকে জ্বালানির বাজারে একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো।

বিইআরসি শুধুমাত্র নীতি গ্রহণকারী। এমনকি এটি নিজের অধিকারের ব্যাপারে পরামর্শ করার অধিকারও রাখে না। এর পরামর্শ প্রয়োজন শুধুমাত্র এবং শুধু যদি সরকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখনই, অন্যথায় এটি একটি অপ্রয়োজনীয় সত্তা।

জ্বালানি সংরক্ষণের বিষয়গুলি মোকাবেলা করার ব্যাপারে বিইআরসি'র কোনো কর্তৃত্ব নেই। বর্তমান উৎপাদন উদ্বৃত্তের পটভূমিতে একটি অত্যাবশ্যক বিধান, যদি থাকে, জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অন্তঃ- ও আন্তঃ-প্রজন্মীয় সমতা নিশ্চিত করার অগ্রাধিকার থাকা প্রয়োজন।

২৫
জ্বালানি জরুরি অবস্থায় বিইআরসিকে পরামর্শ করার কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে অন্যান্য অংশীজনের সাথে সমন্বয় করার ব্যাপারে বিইআরসি ক্ষমতা প্রয়োগে সামর্থ্য নয়।

জ্বালানি খাতের নিয়ন্ত্রক হিসাবে বিইআরসি-এর কাছে জ্বালানি বাজার সম্পর্কে সরাসরি তথ্য থাকবে এবং বিইআরসি বাজারের গতিপ্রকৃতি বুঝতে পারবে বলে আশা করা হয়। অথচ জ্বালানি জরুরি অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বিইআরসি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

২৭(১-২), ২৮
যদিও বিইআরসি আইন অনুযায়ী বিপিসি বিইআরসি'র লাইসেন্সি, তবুও তারা লাইসেন্সি হিসেবে কাজ করে না। কারণ এলপিজি ব্যতীত সকল পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যহার আইনি কর্তৃত্ব ছাড়াই সরকার সরাসরি নির্ধারণ করে।

২৯(১-৩)
এটি একটি অস্পষ্ট বিধান এবং রাজনৈতিক অপব্যবহারের ঝুঁকিতে ভরা। অব্যাহতির শর্তগুলো যতটা সম্ভব বিইআরসি আইনেই স্পষ্ট থাকা উচিত। অন্যথায়, অব্যাহতি ধারা নিয়ন্ত্রকদের নির্বিচারে ব্যবহারের শিকার হতে পারে।

অব্যাহতি ধারার উদাহরণ হিসেবে, কেউ ভুটানের ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট ২০০১-এর ধারা ১৯ উল্লেখ করতে পারেন।

ধারা ১৯।- অব্যাহতি

১৯.১ কর্তৃপক্ষ যে-কোনো ব্যক্তিকে ধারা ১৮ এর অধীনে লাইসেন্সের আবশ্যকতা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। এই ছাড়ের মধ্যে ৫০০ কিলোওয়াটের নিচে বিদ্যুতের উৎপাদন

অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, তবে সীমাবদ্ধ নয়।

১৯.২ কোনো ছাড় সাধারণ বা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে।

১৯.৩ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট করা শর্তাবলী এবং সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে ছাড় দেওয়া হয়।

৩৪(১)

মূল্যহার নির্ধারণে বিইআরসিকে কিছুটা সক্রিয় দেখা যায়। তবে এক অর্থবছরে একাধিক বার মূল্যবৃদ্ধি করা, মূল্যহার নির্ধারণে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ ও ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা, এবং ভোক্তা স্বার্থ ও অধিকার বিবেচনা না নেওয়া পুরো জ্বালানি সেবাকে লুণ্ঠনের হাতিয়ারে পরিণত করেছে এবং লাইসেন্সিদেরকে ভোক্তাবিরোধী করে তুলেছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যহার নির্ধারণ কর্তৃত্ব উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিইআরসি'র এখতিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে। যদিও বিইআরসি আইনে বিইআরসিকেই এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

৩৪(২)

বিইআরসি জ্বালানি-অনুসন্ধান/ উৎপাদন, সঞ্চালন/ পরিবহন, বিপণন, বিতরণ, সরবরাহ এবং মজুদ ব্যয়ের সাথে মূল্যহারের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বরাবরই ডেসকো ও ডিপিডিসি'র বিতরণ চার্জ এবং পিজিসিবি'র হুইলিং চার্জ প্রকৃত রাজস্ব চাহিদার তুলনায় অধিক পরিমাণে নির্ধারণ করা হয়। তিতাসের বিতরণ চার্জও রাজস্ব চাহিদার অপেক্ষা অধিক। বাপেক্স ও বিজিএফসিএল-এর গ্যাসের মূল্যহারও রাজস্ব চাহিদার অপেক্ষা অধিক। এলপিজি'র মূল্যহারও রাজস্ব চাহিদার অপেক্ষা অধিক হারে নির্ধারণ করা হয়। আবার সে-মূল্যহার লাইসেন্সিরা মানে। তাদের নিজেদের নির্ধারিত

অধিক মূল্যহারে এলপিজি বিক্রি করে। ডিজেল, কেরোসিন এবং ফার্নেস অয়েলের মূল্যহার রাজস্ব চাহিদার অপেক্ষা অধিক হারে এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে জ্বালানি বিভাগ নির্ধারণ করে।

গণশুনানির ভিত্তিতে লাইসেন্সির রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বিইআরসি কর্তৃক প্রতিটি এনার্জির মূল্যহার নির্ধারণ হতে হবে। ন্যূনতম ব্যয়ে ভোক্তাকে এনার্জি সরবরাহ করতে হবে। গণশুনানিতে উপস্থাপিত ভোক্তাপক্ষের প্রস্তাব ন্যায্য ও যৌক্তিক প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বিইআরসি গ্রহণ করেনি। লাইসেন্সিদের স্বার্থে মূল্যহার বৃদ্ধি করে। ভোক্তাঅধিকার বঞ্চিত হয়। বিইআরসি আইনের ৩৪(২)খ. ধারার চরম লঙ্ঘন হয় এবং বিইআরসি আইনের উদ্দেশ্য খর্ব হয়।

৩৪(৩)

২০১২ সালে বিইআরসি পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যহার নির্ধারণ সম্পর্কিত ৩টি প্রবিধান তৈরি করে। অন্য সব প্রবিধানমালা সরকারের সম্মতি পায় এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়ে কার্যকরও হয়। কিন্তু উক্ত ৩টি প্রবিধানমালা জ্বালানি বিভাগ আজ অবধি আটকে রেখেছে। সরকার তথা জ্বালানি বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে প্রবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার বিইআরসি'র। মন্তব্য বা আপত্তি প্রদানে সরকারের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা থাকতে হবে এবং সেই সময়ের মধ্যে সম্মতি বা আপত্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রবিধানমালা গেজেটে প্রকাশ করে কার্যকর করার ক্ষমতা বিইআরসি'র থাকতে হবে।

৩৪(৪,৬)

বারবার এসব বিধান লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, সর্বশেষ ডিজেল এবং কেরোসিনের মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রস্তাব বিইআরসি-তে আসেনি। গণশুনানি হয়নি। বিপিসি বিইআরসি আইন লঙ্ঘন করে জ্বালানি বিভাগে

মূল্যবৃদ্ধি প্রস্তাব দেয় এবং জ্বালানি বিভাগ মূল্যবৃদ্ধি করে। বিইআরসি আইন লঙ্ঘন শাস্তিমূলক অপরাধ হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

অধিকন্তু, যখন কোনো লাইসেন্সি কোনো জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণ বা মূল্যায়ন করার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে না, তখন বিইআরসি নীরব থাকে যে তাদের নিজস্ব প্রস্তাবের উপর গণশুনানি করার ক্ষমতা নেই। ২০২০ সালে একটি ব্যতিক্রম বছর ছিল যখন কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশিরভাগ লাইসেন্সি ভূতুড়ে বিদ্যুৎ বিল চার্জ করেছিল, বিইআরসি তাদের নিজস্ব উদ্যোগে বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত আদেশ দেয়।

মূল্যহার নির্ধারণে বিইআরসি তার নিজস্ব আইন অনুসরণ করে না। লাইসেন্সিদের দাখিলকৃত লুণ্ঠনমূলক ব্যয় সমন্বয়ে লুণ্ঠনমূলক মূল্যহার নির্ধারণ করে। প্রতিযোগিতামূলক জ্বালানি বাজার নিশ্চিত করা বিইআরসি'র মৌলিক দায়িত্ব। কিন্তু বিইআরসি সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। সক্ষমতা বৃদ্ধির নামে চাহিদার তুলনায় লাইসেন্সীরা উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সম্পদ বেশি বেশি বৃদ্ধি করছে। তাতে একদিকে জনগণের অর্থের অপচয় ও দুর্নীতি বাড়ছে, অন্যদিকে এনার্জি সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধিতে ভর্তুকি ও মূল্যহার বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। ফলে ভোক্তাস্বার্থ ও অধিকার খর্ব হচ্ছে। বিইআরসি আইনের উপধারা ২২(জ, ট ও ড) মতে এমন অবস্থা প্রতিরোধ ও প্রতিকার করার দায়িত্ব বিইআরসি'র। কিন্তু বিইআরসি সে দায়িত্ব পালনে শতভাগ ব্যর্থ।

৩৫-৩৭
বিইআরসি ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষায় তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ না করলে বা ব্যর্থ হলে তাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আসতে হবে। ২০০৮ সাল থেকে, বিইআরসি কখনো তার ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি।

৩৯(১)
"গোপন তথ্য" বলতে কী বোঝায় তা বিইআরসি আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। বিধানটি অস্পষ্ট।

এছাড়াও, এই ধরনের বিধান জনগণের তথ্যের অধিকার খর্ব করে। এটি দীর্ঘমেয়াদে একদিকে কায়েমি স্বার্থবাদী দুর্নীতিবাজদের ক্ষমতায়ন করে, অন্যদিকে জবাবদিহিতা ও সুশাসনকে দুর্বল করে।

৪২
বিইআরসি আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আমলে নিতে নারাজ। উদাহরণস্বরূপ, বিইআরসিকে উপেক্ষা করে ডিজেল এবং কেরোসিনের মূল্যহার নির্ধারণ বিইআরসি আইনের ধারা ৪২ মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উক্ত অভিযোগ বিইআরসি'তে দাখিল করা হলেও বিইআরসি নিষ্ক্রিয়। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, বিইআরসি আইন প্রয়োগকারী হিসাবে একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠান।

৪৩
বিইআরসি তার আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগও আমলে নিতে নারাজ। উদাহরণস্বরূপ, এলপিজি লাইসেন্সিদের বিরুদ্ধে আনীত উক্ত অভিযোগ বিইআরসি'তে দাখিল করা হলেও বিইআরসি নিষ্ক্রিয়। ২০০৯ সালে থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর অবধি বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত এলপিজির কোনো মূল্যহারই লাইসেন্সিরা মানেননি। অথচ বিইআরসি তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

৪৪
ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট ১৯১০ ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট ২০১৮ দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। নতুন আইন বিইআরসি আইনের ৪৪ ধারায় প্রতিস্থাপিত হতে হবে।

৪৭
এই বিধানটি যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির বিচারিক সহায়তা চাওয়ার অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে, যা বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক।

বিইআরসির সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

৫৪(১-৬)
বিইআরসি কখনোই ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব)-এর পক্ষ থেকে বেশ কিছু অভিযোগ বিইআরসিতে দাখিল করা হলেও তা নিষ্পত্তি না হওয়ায় ক্যাবকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয়েছে। কয়েক দফায় সুপ্রিম কোর্ট বিইআরসির নিষ্ক্রিয়তাকে কটাক্ষ ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। বিইআরসি লাইসেন্সিদের বিরোধ নিষ্পত্তি এবং লাইসেন্সধারীদের উদ্দেশ্য পূরণে সক্রিয়।

৫৯(১)
যদিও বিইআরসি প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে, কিন্তু সরকারের সাথে পরামর্শ করার বিধান একটি বড় সমস্যা থেকে যায়, যখন সরকার বছরের পর বছর ধরে সাড়া দেয় না।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন

পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ

পর্যবেক্ষণ-১

ক. আইনের ৭(১) উপধারায় বর্ণিত বিইআরসি'র চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তাঁদের নিয়োগের সময় প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়।

সুপারিশ

ক. অধিকতর কার্যকর কমিশন গঠনের জন্য আইনে বর্ণিত আবশ্যকীয় যোগ্যতাবলী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পূরণ হতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-২

ক. যেহেতু জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এনার্জি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চালিকা শক্তি, সেহেতু বিইআরসি চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিয়োগ বা পুনর্নিয়োগে সমঝোতা হতে পারে। তাই মন্ত্রণালয় ও বিইআরসি স্বার্থসংঘাতযুক্ত।

খ. শুধু তাই নয়, যখন বিইআরসি এবং লাইসেন্সি উভয়ই মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন, তখন বিইআরসি'র স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে ভোক্তার অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ অনিশ্চিত। অতীতের নির্ধারিত এনার্জির মূল্যহার এবং বিইআরসি'র গণশুনানি তারই প্রমাণ।

সুপারিশ

ক. একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিইআরসি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে এবং লাইসেন্সিদের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী ক্ষমতা বিইআরসি কর্তৃক পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভোক্তাস্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত হতে হবে।

খ. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উভয় বিভাগের কর্মকর্তাদের বিইআরসি'র সকল লাইসেন্সিদের পরিচালনা পর্ষদ থেকে অবমুক্ত হতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-৩

ক. "কমিশনের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ" বা "নিজেকে এমনভাবে পরিচালনা করে বা তার অবস্থানের অপব্যবহার করে যা এই আইনের উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষতিকর বা জনস্বার্থকে বাধাগ্রস্ত করে"– এমন সব শর্তাবলী আইনে স্পষ্টভাবে বিবৃত নয়। আদালত থেকেও কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এতে **বিভ্রান্তি তৈরি হয়।**

সুপারিশ

ক. আইনে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অপসারণের পদ্ধতি অস্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়। প্রবিধানের মাধ্যমে অপসারণ পদ্ধতি আরও বেশি স্পষ্টীকরণ করা আবশ্যক এবং তাতে পদ্ধতির বিশদ বিবরণ থাকতে হবে।

খ. বিইআরসি'র চেয়ারম্যান ও সদস্যদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি। আইনে অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। প্রবিধানের মাধ্যমে বিইআরসি ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে যোগাযোগের একটি সেতু স্থাপিত হতে হবে।

গ. বিইআরসি-এর চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিজ নিজ নিয়োগের আগে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-৪

ক. জ্বালানি নীতির ব্যাপারে সরকারের কাছে উপদেষ্টা হিসেবে বিইআরসি'র কোনো ভূমিকা নেই।

খ. আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিইআরসি তার বেশিরভাগ কার্য সম্পাদনে অকার্যকর। উদাহরণস্বরূপ, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি করা, শক্তির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা, প্রতিযোগিতামূলক বাজার নিশ্চিত করা, সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা, ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি ও সালিশ করা এবং বাজারে একচেটিয়া রোধ করা – এগুলোর কোনোটিই বিইআরসি করে না।

গ. ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি, অসাধু ব্যবসা অনুশীলন, বাজারে একচাটিয়া প্রতিরোধ ও প্রতিকারে বিইআরসি অকার্যকর।

সুপারিশ

ক. বিইআরসি'কে আরও কার্যকর হওয়ার জন্য তার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে হবে, তাকে জ্বালানি সংক্রান্ত সমূদয় তথ্য প্রাপ্তিতে ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, সময়োপযোগী সুপারিশ ও ভোক্তাদের মতামত সরকারকে নিয়মিত অবহিত করতে হবে, জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। এ-সব কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোক্তার জ্বালানি অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করে বিইআরসিকে ভোক্তা সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

খ. আরও বেশ কিছু কার্যক্রম বিইআরসি'র দায়িত্ব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যেমন,

- নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার এবং অ-নবায়নযোগ্য শক্তি সংরক্ষণে ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- সকল ধরনের জ্বালানি উন্নয়ন গবেষণা ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা;
- জ্বালানি আইনসমূহ পর্যালোচনা করা এবং ভোক্তাস্বার্থে তা পরিবর্তনের জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা;
- জ্বালানি সংরক্ষণ নীতি নিয়মিত হালনাগাদ করা;
- এনার্জি ট্রেডিং পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং
- জ্বালানি নিলাম নীতি সংস্কার করা।

পর্যবেক্ষণ ৫

ক. জ্বালানি বাজার তদন্ত করার ক্ষেত্রে বিইআরসি তার ক্ষমতা ব্যবহারে নিষ্ক্রিয়।

খ. দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে বিচারের সময় বিইআরসি কখনও দেওয়ানি আদালতের মতো কার্যক্রম চালিয়েছে কিনা তার কোন তথ্য-প্রমাণ নেই। যেমন: ক. একজন সাক্ষীকে তলব করা এবং শপথের সময় সাক্ষীর উপস্থিতি এবং পরীক্ষা নিশ্চিত করা; খ. নথি বা প্রমাণাদি মূল্যায়ন করা; গ. হলফনামার মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ করা; ঘ. কোন আদালত বা অফিস থেকে পাবলিক রেকর্ড তলব করা; শুনানি পরিচালনা বা স্থগিত করা; (চ) পক্ষগণের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি নিশ্চিত করা; এবং/বা (ছ) বিইআরসি'র নিজস্ব সিদ্ধান্ত, নির্দেশ বা আদেশ পর্যালোচনা করা।

গ. বিইআরসি'র অতীতে পরিচালিত কোনো তদন্ত কার্যক্রম বা শুনানিতে কোনো অন্তর্বর্তী আদেশ হয়েছে কি না সে সংক্রান্ত কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই।

সুপারিশ

ক. দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বিইআরসি'কে জবাবদিহিতার আওতায় আনার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-৬

ক. বিইআরসি শুধুমাত্র একটি নীতি গ্রহণকারী। এমনকি এটি নিজের অধিকারের ব্যাপারে পরামর্শ করার অধিকারও রাখে না। এর পরামর্শ প্রয়োজন শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র যদি সরকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখনই, অন্যথায় এটি একটি অপ্রয়োজনীয় সত্তা।

সুপারিশ

ক. জ্বালানির ব্যাপারে নীতি নির্ধারণীতে সরকারের সঙ্গে বিইআরসি'র পরামর্শের অধিকার থাকতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-৭

ক. জ্বালানি জরুরি পরিস্থিতিতে বিইআরসি'কে পরামর্শের কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে অন্যান্য অংশীজনের সাথে সমন্বয় করে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে বিইআরসি অসমর্থ।

সুপারিশ

ক. জ্বালানি জরুরি পরিস্থিতিতে সরকারের সাথে বিইআরসি'র পরামর্শের অধিকার থাকতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-৮

ক. বিইআরসি আইনের অধীনে লাইসেন্সিং বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় না।

সুপারিশ

ক. লাইসেন্সিং বিধানাবলী কঠোরভাবে প্রতিপালিত হতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-৯

ক. লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতির বিধানবলী অস্পষ্ট এবং রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহারের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ।

সুপারিশ

ক. অব্যাহতির শর্তাবলী যতটা সম্ভব বিইআরসি প্রবিধানে আরো স্পষ্ট হতে হবে। অন্যথায়, অব্যাহতি ধারাসমূহ নিয়ন্ত্রকদের নির্বিচারে ব্যবহারের শিকার হবে।

পর্যবেক্ষণ-১০

ক. মূল্যহার নির্ধারণে তথা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিইআরসি'কে কিছুটা সক্রিয় দেখা যায়। তবে লাইসেন্সিদের পক্ষ থেকে মূল্যহার

পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব না পেলে বিইআরসি নিষ্ক্রিয় থাকে। ভোক্তাস্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষা বিবেচনায় নেয় না।

খ. এক অর্থবছরে একাধিক বার মূল্যবৃদ্ধি করা, ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার সাথে মূল্যবৃদ্ধির সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং মূল্যবৃদ্ধিতে ভোক্তাস্বার্থ উপেক্ষা করার কারণে পুরো প্রক্রিয়া বিইআরসি'কে কর্পোরেট-বান্ধব এবং ভোক্তা সাধারণের শত্রুতে পরিণত করেছে।

গ. পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যহার নির্ধারণের এখতিয়ার বিইআরসি'র হলেও এলপিজি ব্যতীত অন্য কোনো পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্যহার বিইআরসি নির্ধারণ করে না। এখতিয়ার-বহির্ভূতভাবে জ্বালানি বিভাগ নির্ধারণ করে। আবার কোনো কোনোটির মূল্যহার নির্ধারণ করে বিইআরসি'র লাইসেন্সি বিপিসি। অথচ বিইআরসি নিষ্ক্রিয়।

সুপারিশ

ক. মূল্যহার বছরে একাধিক বার বৃদ্ধি পরিহার করা আবশ্যক।

খ. মূল্যহার নির্ধারণ পদ্ধতিতে ভোক্তাস্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত হতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-১১

ক. এনার্জি উৎপাদন, সঞ্চালন, বিপণন, বিতরণ, সরবরাহ এবং মজুদ ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে মূল্যহার নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিইআরসি ব্যর্থ।

সুপারিশ

ক. বিইআরসি-কে অবশ্যই জ্বালানি উৎপাদন, সঞ্চালন, বিপণন, বিতরণ, সরবরাহ এবং সঞ্চয় – এ-সবের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায্য ও যৌক্তিক ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লাইসেন্সি

রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণ করে ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণ নিশ্চিত করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-১২

ক. কাফকো ও লাফার্জের যথাক্রমে সার ও সিমেন্ট উৎপাদনে ভর্তুকিতে গ্যাস প্রদান জনস্বার্থবিরোধী।

খ. আমদানি বাজারের পূর্ববর্তী মাসের মূল্যহার সমন্বয় করে অভ্যন্তরীণ বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজির মূল্যহার নির্ধারণ করার বিধান ছিল। সে বিধান পরিবর্তন করে আমদানি বাজারের চলতি মাসের মূল্যহার সমন্বয় করে অভ্যন্তরীণ বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজির চলতি মাসে মূল্যহার বিইআরসি সম্পূর্ণ অন্যায় ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে বৃদ্ধি করেছে।

গ. সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি এলপিজিসিএল-এর সাশ্রয়ী মূল্যের এলপিজির ওপর প্রান্তিক ভোক্তাদের মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ক্যাবের প্রস্তাব বিইআরসি'র আমলে না নেয়ায় প্রান্তিক জনগণকে জ্বালানি অধিকার থেকে বঞ্চিত করার শামিল।

সুপারিশ

ক. অভ্যন্তরীণ শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্যহারের সাথে সমতা রক্ষা করে লাফার্জ ও কাফকোর ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

খ. ভোক্তাস্বার্থে আমদানি বাজারের পূর্ববর্তী মাসের মূল্যহার সমন্বয় করে অভ্যন্তরীণ বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে চলতি মাসের এলপিজির মূল্যহার নির্ধারণের ব্যাপারে পূর্বের বিধান বলবৎ হতে হবে।

গ. বিদ্যুতের অনুরূপ এলপিজিসহ প্রান্তিক জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্বালানির ওপর তাদের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-১৩

ক. বিইআরসি আইনের ধারা ৫৯ এর অধীনে পেট্রোলিয়াম পণ্যসমূহের মূল্যহার নির্ধারণ প্রবিধান বিইআরসি তৈরি করতে পারেনি এবং প্রকারান্তে নিষ্ক্রিয়।

সুপারিশ

ক. বিইআরসি'কে প্রবিধান প্রণয়নে তার আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-১৪

ক. গণশুনানিতে প্রতিষ্ঠিত যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা উপেক্ষা করে লাইসেন্সিদের স্বার্থে বিইআরসি হরহামেশায় বিইআরসি আইন লঙ্ঘন করে মূল্যহার নির্ধারণ করে গণশুনানিকে প্রহসনে পরিণত করেছে।

সুপারিশ

ক. মূল্যহার নির্ধারণে বিইআরসি'র নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে হবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত হতে হবে।

খ. লাইসেন্সিদের পক্ষ থেকে মূল্যহার পরিবর্তন প্রস্তাব না করা হলে ভোক্তাস্বার্থে বিইআরসি'কে স্ব-প্রণোদিত হয়ে মূল্যহার গণশুনানির ভিত্তিতে পর্যালোচনাক্রমে পূণর্নির্ধারণ করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ -১৫

ক. বিইআরসি'র আদেশ লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে বিইআরসি ব্যবস্থা গ্রহণে অনাগ্রহী এবং নিষ্ক্রিয়।

সুপারিশ

ক. বিইআরসি'র আদেশ লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে বিইআরসি'কেই ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় বিইআরসি আইন লঙ্ঘনের দায়ে ওই আইনের অওতায় বিইআরসি'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত হতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-১৬

ক. "গোপন তথ্য" বলতে কী বোঝায় তা বিইআরসি আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। ফলে বিধানটি অস্পষ্ট।

খ. এছাড়াও, এই ধরনের বিধান জনগণের তথ্য অধিকার খর্ব করে। এটি দীর্ঘমেয়াদে দুর্নীতিবাজদের ক্ষমতায়ন করে এবং জবাবদিহিতা ও সুশাসনকে দুর্বল করে।

সুপারিশ

ক. তথ্য অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করে "গোপন তথ্য" শব্দটিকে বিইআরসি কর্তৃক সংজ্ঞায়িত হতে হবে।

খ. যখন ভোক্তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ থাকে, তখন প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে এই ধারা বাধা হবে না।

পর্যবেক্ষণ-১৭

ক. বিইআরসি আইন লঙ্ঘনের দায়ে ব্যবস্থা গ্রহণে বিইআরসি নারাজ।

সুপারিশ

ক. এমন অবস্থায় বিইআরসি নিজেই বিইআরসি আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হবে। তাই বিইআরসি'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত হতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-১৮

ক. বিদ্যুৎ চুরির শাস্তির বিধান ১৯১০ সালের বিদ্যুৎ আইনে করা হয়েছে।

সুপারিশ

ক. যেহেতু ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট ১৯১০ ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট ২০১৮ দ্বারা বাতিল করা হয়েছে, সেহেতু নতুন আইন ব্যবহার হবে।

পর্যবেক্ষণ-১৯

ক. বিইআরসি আইনের ধারা ৪৭ অনুযায়ী যে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির বিচার পাওয়ার অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে, যা বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক।

সুপারিশ

ক. উক্ত ধারার আওতায় দাখিলকৃত ভোক্তা অভিযোগ আমলে নিয়ে বিইআরসি'কে অবশ্যই অদালতে মামলা দায়ের করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-২০

ক. ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিইআরসি নিষ্ক্রিয়। বিইআরসি আইনের ৫৪(৪) ও ৫৪(৬) ধারায় বিইআরসি'কে ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অথচ বিইআরসি'র নিষ্ক্রিয়তায় ভোক্তা বিচার প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত।

সুপারিশ

ক. ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি না করায় বিইআরসি বিইআরসি আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত। সে অভিযোগের দায়ে বিইআরসি আইনের আওতায় বিইআরসি'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত হতে হবে।

খ. অতীতে ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির একটি প্রবিধান বিইআরসি প্রণয়ন করলেও তা কার্যকর না হওয়া বিইআরসি'র নিষ্ক্রিতারই প্রমাণ। অতএব, বিইআরসি'কে অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ-২১

ক. বিইআরসি আইনের ৫৯ ধারায় বিইআরসি'কে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। উক্ত ক্ষমতাবলে বিইআরসি ওই দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়, যা বিইআরসি আইন লঙ্ঘনের শামিল।

সুপারিশ

ক. প্রবিধান প্রণয়ন না করতে পারা একটি অক্ষমতা এবং বিইআরসি আইন লঙ্ঘন। ফলে বিইআরসি'র বিরুদ্ধে উক্ত আইন লঙ্ঘনের দায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত হতে হবে।

সংযুক্তি ২

এক দশকে ভোক্তা পর্যায়ে
জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধির চিত্র

বিদ্যুৎ

মূল্য (টাকা/ইউনিট)

ভোক্তা শ্রেণী	১ মার্চ ২০১০ এর আগে	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০	% বৃদ্ধি
গৃহস্থালী (ইউনিট/মাস)			
১-৫০ (লাইফ লাইন ভোক্তা)	২.৫০ (১-১০০ ইউনিট)	৩.৭৫	৫০%
১-৭৫		৪.১৯	৬৮%
৭৬-২০০		৫.৭২	৮২%-১২৯%
২০১-৩০০	৩.১৫ (১০১-৪০০ ইউনিট)	৬.০০	৯১%
৩০১-৪০০		৬.৩৪	১০১%
৪০১-৬০০	৫.২৫ (৪০০ ইউনিটের বেশী)	৯.৯৪	৮৯%
৬০০+		১১.৪৬	১১৮%
সেচ পাম্প	১.৯৩	৪.১৪	১১৬%
ফ্ল্যাট রেট			
বানিজ্যিক ও অফিস	৫.৩০	১০.৩০	৯৪%
ক্ষুদ্র শিল্প	৪.০২	৮.৫৩	১১২%
বৃহদ শিল্প			
মধ্যম চাপ (১১ কেভি)	৩.৮০	৮.৫৫	১২৫%
উচ্চ চাপ (৩৩ কেভি)	২.৩৯-২.৫৩	৮.৪৫	সর্বোচ্চ ২৫৪%
অতি উচ্চ চাপ (১৩২ কেভি)	২.৩৪	৮.৩৬	২৫৭%
অতি উচ্চ চাপ (২৩০ কেভি)	নাই	৮.৩১	
গড় পাইকারি মূল্য	২.৩৭	৫.১৭	১১৮%
গড় খুচরা মূল্য	৩.৭৬	৭.১৩	৮৯.৬৩%

প্রাকৃতিক গ্যাস

মূল্য (টাকা/ঘন মিটার)

ভোক্তা ধরন	৩১ জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত দাম	১ জুলাই ২০১৯	% বৃদ্ধি
আবাসিক			
মিটার ভিত্তিক	৩.৬৮	১২.৬০	২৪২.৩৯%
এক চুলা	৩৫০	৯২৫	১৬৪.২৯%
দুই চুলা	৪০০	৯৭৫	১৪৩.৭৫%
অন্যান্য			
বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২.১০	৪.৪৫	১১১.৯০%
ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩.০০	১৩.৮৫	৩৬১.৬৭%
বানিজ্যিক	৬.৬০	২৩.০০	২৪৮.৪৮%
সিএনজি	১৬.৭৫	৪৩	১৫৬.৭২%
সার	১.৮০	৪.৪৫	১৪৭.২২%
শিল্প বয়লার	৪.১৯	১০.৭০	১৫৫.৩৭%
ভারিত গড়	৪.৩৪	৯.৯৬	১২৯.৪৯%

জ্বালানি তেল

মূল্য (টাকা/লিটার)

জ্বালানি তেল	২৩ জানুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত	২৪ জানুয়ারি ২০১১	৪ জানুয়ারি ২০১৩	২৫ মার্চ ২০১৬	২৫ এপ্রিল ২০১৬	% বৃদ্ধি
ডিজেল/ কেরোসিন	৪২	৪৪	৬৮	৬৮	৬৫	৫৪.৭৬%
ফর্নেস অয়েল	২৬	৩৫	৬০	৪২	৪২	৬১.৫৪%
পেট্রোল	৭২	৭৪	৯৬	৯৬	৮৬	১৯.৪৪%
অকটেন	৭৫	৭৭	৯৯	৯৯	৮৯	১৮.৬৭%

বাংলাদেশ জ্বালানি রূপান্তর নীতি ২০২২